জীবনের
জয়যাত্রায়
মানুষ

জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ

সুধাংশু পাত্র

পরিবেশক

●

সরকার বুক স্টল
তেমাথা, চন্দননগর
হুগলী

প্রথম প্রকাশ
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

প্রকাশিকা :
গীতা ভট্টাচার্য্য
সুভাষপল্লী, খলিসানী
হুগলী।

মুদ্রক :
মাতৃমুদ্রণ
ফটকগোড়া, চন্দননগর

প্রচ্ছদ :
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

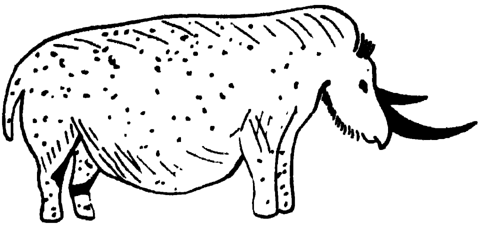
বিখ্যাত শিশু-সাহিত্য A Picturesque Tale of Progress এবং Odhams Wonder World of Knowledge থেকে বেশীরভাগ তথ্য ও ছবি গ্রহণ করা হয়েছে। ছবিগুলি অঙ্কন করেছেন শ্রীঅভিমন্যু মন্ডল এবং জীবাশ্ম ও জীবের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশগুলি প্রদান করেছেন ডঃ অমৃতাভ দাস। বাংলায় প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা ভারতকোষ এবং এ্যান অ্যামেরিকান এডুকেটর এনসাইক্লোপিডিয়াও গ্রন্থটি রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাসমুদ্রের মহাবিস্ময়

সূচীপত্র


পঞ্চাশহাজার বছর
আগের মানুষ



গুহাগাত্রে অঙ্কিত গণ্ডারের ছবি



ক্রোম্যাগনন মানুষ

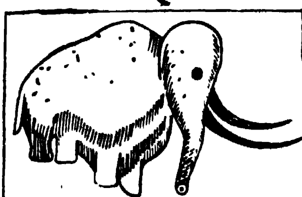


নিয়ানডার্থাল মানুষ

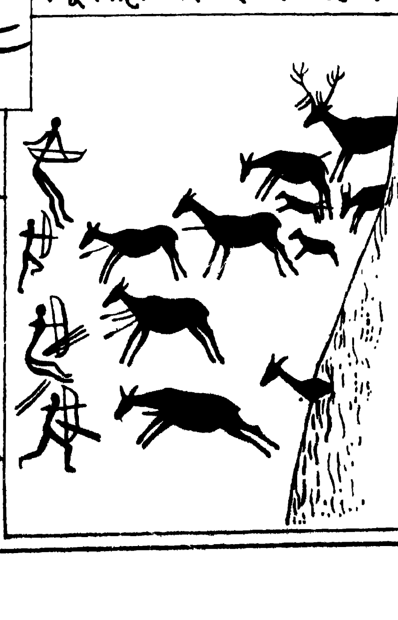


ক্রোম্যাগনন মানুষ

▼ ২০০০০ বছর আগে গুহাগাত্রে অঙ্কিত ম্যামথের ছবি



▼ গুহাগাত্রে অঙ্কিত হরিণশিকারের চিত্র





▲ প্রস্তর যুগের উন্নত হাতিয়ার



প্রথম আগুন আবিষ্কার



প্রথম অঙ্গ আচ্ছাদনের উপায় আবিষ্কার



গুহামানব ও পোষাকুকুরের ব্যবহার

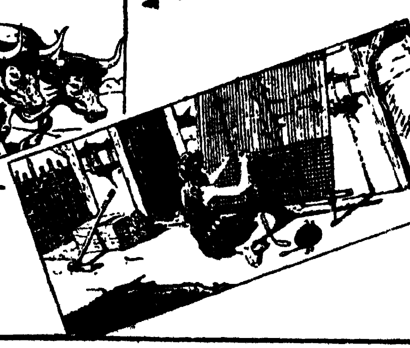


হ্রদের তীরে বাসগৃহ নির্মাণ

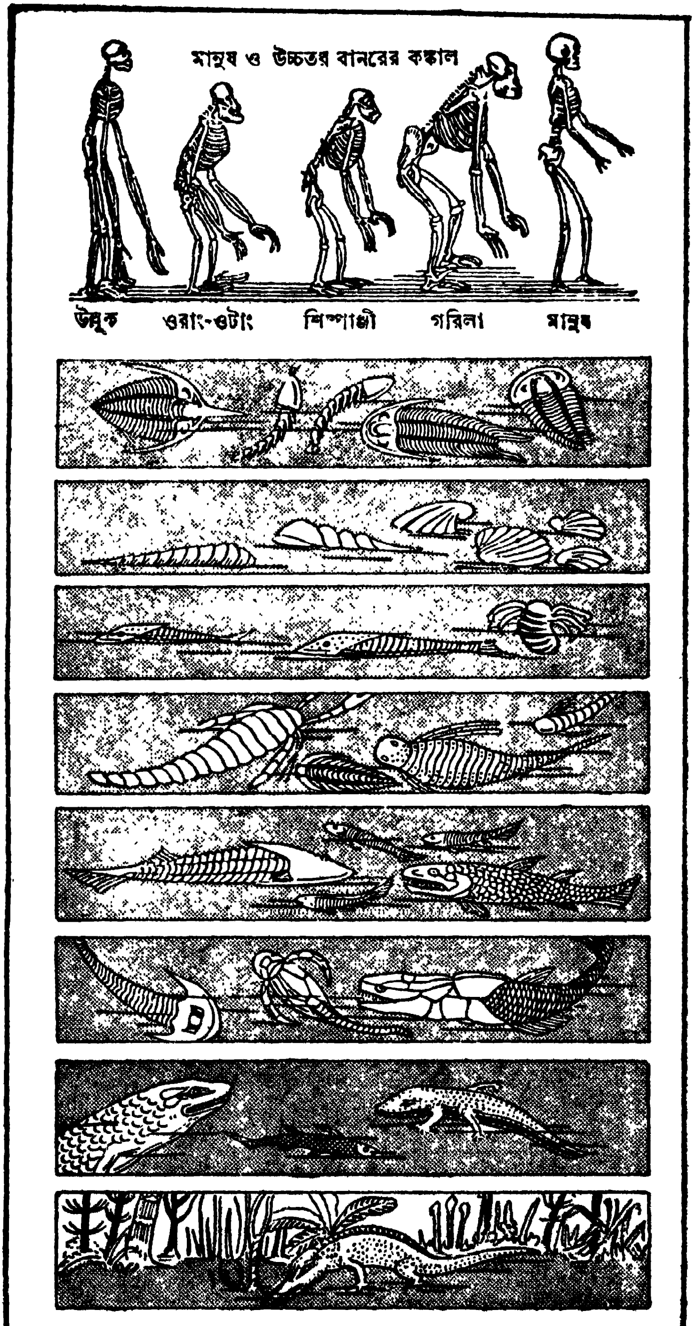




প্রথম লাঙল



প্রথম বস্ত্রবয়ন


মানুষ ও উচ্চতর বানরের কঙ্কাল
উল্লুক
ওরাং-ওটাং
শিম্পাঞ্জী
গরিলা
মানুষ

মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রাচীন মত

শিশুর মুখে যখন আধো আধো বুলি ফোটে তখন মাকে প্রশ্ন করে. "মা গো, আমি কোথায় ছিলেম!"

তেমনই সভ্যতার প্রথম প্রত্যূষে মানুষ যেদিন নিজের দিকে তাকাতে শিখেছিল সেইদিনই সে প্রশ্ন করেছিল নিজেকে "আমি কে! কোথায় ছিলাম? কোথা থেকেই বা আগমন হয়েছে?" পিতার পিতা, তাঁর পিতা—এইভাবে ক্রমাগত অতীতের দিকে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে মানুষ জাতটা কি একটি মাত্র অথবা কয়েকটি মানব দম্পতির কাছে থেমে যাবে? যদি তাই হয়, তাহলে সেই আদি মানব-মানবীরা কোথা থেকে এসেছিলেন?

সেদিন মনে হয় প্রশ্নটির কোন সন্তোষজনক উত্তর কেউ খুঁজে পায়নি। তাই সহস্র সহস্র বছর ধরে পণ্ডিত ও দার্শনিকরা মাথা ঘামাতে বাধ্য হয়েছিলেন। চারদিকে বিচরণরত অজস্র পশুপাখীকে দেখে বার বার বিস্মিতও হয়েছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এদের থেকে মানুষ কেন এমন স্বতন্ত্র! তার মুখের ভাষা, গলার স্বরলহরী কেন এত সুন্দর? কেমন করে শিখলো সে ঘর বাঁধতে? কেমন করেই বা গঠন করলো সমাজ? এত ক্ষুরধার বুদ্ধি আর এত বিবেচনা শক্তি কেমন করেই বা লাভ করলো?

অরণ্যে-বন্দরে, পর্বতগাত্রে, নদীর কূলে কূলে, বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই পুরাতন প্রশ্নটা। বিজ্ঞানসম্মত কারণ কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি বলে মনে হয়। মা যেমন ছোট ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন "ঈশ্বর তোকে রেখেছিলেন আমারই বুকের মাঝে।" তেমনই পণ্ডিত ও দার্শনিকরা ধরে নিয়েছিলেন, মানুষের উৎপত্তির মূলে আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খেয়াল। তিনি যেহেতু জগৎস্রষ্টা, নিজের ইচ্ছায় যেমন পৃথিবী ও তার জীবমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন তেমনই আপন খেয়ালে সৃষ্টি করেছেন আপনারই অনুরূপ সুন্দর এই মানুষ জাতটাকে।

বলা বাহুল্য, সেদিন যা ছিল মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়, তার সবটুকুকে ব্যাখা করা হয়েছিল একজন স্রষ্টার কল্পনা করে।

মানবমনের চিরন্তন একটি বৈশিষ্ট্যও আছে। মনে কোন প্রশ্ন জাগলে সে তাকে সমাধান না করে যেন কিছুতেই স্বস্তি পায়না। সেদিন যেহেতু বিজ্ঞান আদৌ উন্নত ছিলনা, ব্যাখ্যা করার মত কোন হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়নি, তাই স্রষ্টার কল্পনা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিলনা। ধরে নিয়েছিল পার্থিব সব কিছুর মূলে আছে তাঁরই অদৃশ্য হাতের পরশ। তাই আপন মনের প্রশ্নগুলিকে তাঁরই মাথায় চাপিয়ে রচনা করেছিল কাহিনীর পর কাহিনী। সেই কাহিনীগুলিই পৌরাণিক কাহিনী নামে সব দেশে খ্যাত।

পৃথিবীর যেসব দেশে প্রাচীনকালে ঐ কাহিনীগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ ঈশ্বরের ক্রীড়নক এবং ঈশ্বরই তাকে সৃজন করেছেন! প্রথমে আমাদের নিজের দেশেরই কথা ধরা যেতে পারে। বহু পুরাণে উল্লেখ আছে মানব সৃষ্টির গোড়ার কথা। তবে একমাত্র মনু সংহিতাতেই আছে বিস্তৃত বিবরণ। কথিত হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রথমে নিজ দেহকে পুরুষও নারীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন। আপনসৃষ্ট সেই নারীর গর্ভে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হন বিরাট এক পুরুষরূপে। অতঃপর সেই বিরাট পুরুষ তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি করেন মানব জাতির আদি পুরুষ মনুকে। পরে মনু পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টির সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি প্রভৃতি দশজন প্রজাপতিকে। (কোন কোন পুরাণে প্রজাপতিদের ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংখ্যা দশের পরিবর্তে ষোল, একুশ ইত্যাদি ধরা হয়েছে। নাম বলা হয়েছে ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, যম, তপ, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মরীচি, বশিষ্ঠ, সূর্য, চন্দ্র, কর্দম, পরমেষ্ঠি, ক্রোধ ও বিক্রীত। বেদে আবার ইন্দ্র, সাবিত্রী, হিরণগর্ভ প্রভৃতিকেও প্রজাপতি বলা হয়েছে। এঁরা প্রজাদের সৃষ্টি ও রক্ষা করে থাকেন বলে অনুরূপ নামকরণ।)

মনুসংহিতায় আরও বলা হয়েছে ; প্রজাপতিদের কাছ থেকেই সাতজন মনু, দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, রাক্ষস-পিশাচ, জীব-জন্তু, পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতা, মানুষ প্রভৃতি সব কিছুরই সৃষ্টি।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলিতেও মানবসৃষ্টির ব্যাপারে দেবতাদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, সৃষ্টির আদিপর্বে পাতালপুরীর অন্ধকারের মধ্যে বাস করতো বীভৎস ও কুৎসিত দানবেরা। দেবতাদের সঙ্গে কোন মিল ছিলনা তাদের। না চেহারায়, না স্বভাবে। অপরদিকে বনজঙ্গল সমাকীর্ণ পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করতো যত কুৎসিত জন্তু-জানোয়াররা। দেবতাদের নেতা ক্রোনাস ছিলেন ঐ দানব ও জন্তুজানোয়ারদের রাজা। অথচ তিনি এবং অন্যান্য দেবতারা ছিলেন খুবই সুন্দর। কিছুকাল শাসন করার পর ঐ সব কুৎসিতদের নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না ক্রোনাস। ইচ্ছা প্রকাশ করলেন দেবতাদের মত সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর না থাকায় মনের কথা প্রকাশ করলেন প্রমিথিউস নামে বিশাল দেহধারী এক দেবতার কাছে। প্রমিথিউস ক্রোনাসের কথায় সম্মত হলেন এবং কথা দিলেন, তিনি এমন এক ধরনের জীব সৃষ্টি করবেন যাকে দেখতে হবে দেবতাদের মত অথচ ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু বুদ্ধিতে হবে সব প্রাণীর সেরা।

প্রমিথিউস প্রথমে একতাল কাদামাটি নিয়ে নিজেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি গড়লেন। ক্রোনাস ছিলেন পাশে। মূর্তিটি দেখে তাঁর এত ভাল লাগলো যে, মূর্তি গড়া সম্পূর্ণ হতেই তিনি তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। অতঃপর প্রমিথিউস একের পর এক মূর্তি গড়ে চললেন এবং ক্রোনাস প্রত্যেকটি মূর্তিতে করলেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। এইভাবে সৃষ্টি হলো প্রথম মানুষ ৭

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি সুসভ্য দেশও মানুষের উৎপত্তি রহস্য উদ্ধার করতে গিয়েছিল এবং তারাও রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে দৈবশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। মিশরীয়দের কল্পনা অনুযায়ী আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। অনেককাল পরে

পৃথিবী ব্যাপী সেই মহাসমুদ্রের মাঝখানে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল একটি মাত্র পর্বত। সেই পর্বতের শীর্ষদেশে প্রথমে যাঁরা বসতি স্থাপন করলেন তাঁরা দেবতা! দেখতে অত্যন্ত রূপবান এবং তাঁদের কাছে অসাধ্য কাজ বলতে কিছুই ছিলনা। একদিন কি খেয়াল হলো তাঁদের। নিজেদের মত করে সৃষ্টি করলেন একদল জীবকে। এরাই মানুষ। মিশরীয় কাহিনী অনুযায়ী মিশরের রাজা বা ফ্যারাওরা ঈশ্বরের পুত্র। আর ঈশ্বর পুত্রদের সুবিধার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট মানুষ।

মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনীতে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে অলৌকিকত্ব আরোপিত হলেও আদিম পৃথিবী সম্বন্ধে যতটুকু কল্পনা করেছিল তার সঙ্গে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক মতবাদের কিছুটা মিল আছে। যদিও আদিম জলমগ্ন পৃথিবার কল্পনা ভারতীয়রাও করেছিল।

অনেক পরে রচিত বাইবেলেও মানবসৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কেবল মানুষ নয়, বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছেন ঈশ্বর। পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করার পর তিনি নিজ অবয়বের মত সৃষ্টি করেছিলেন আদি পিতা আদমকে। তারপর আপন বক্ষ-পঞ্জরের একখানা হাড় নিয়ে তৈরি করেছিলেন আদি মাতা ইভকে। ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে যেমন ব্রহ্মা নিজেকে নর ও নারীরূপে দ্বিধা-বিভক্ত করেছিলেন এও যেন অনেকটা তেমনই। কিন্তু বাইবেলে নিষিদ্ধ আপেল খাওয়ার যে গল্পটি আছে, তেমন কোন গল্প ভারতীয় পুরাণে নেই।

প্রসঙ্গত ভারতীয় উপনিষদের কথাও একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। উপনিষদের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এক সত্তার কল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বজ্ঞ অথচ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত। উপনিষদে এই মহান সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে দেবতা, দানব, মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখী এমনকি বিশ্বজগৎটাই তাঁর দ্বারা উৎপন্ন এবং তাঁর কাছে লয়।

ভারতীয় উপনিষদের সঙ্গে ইরাণীয় জেন্দ আবেস্তার আছে অনেকখানি

মিল। উপনিষদের ব্রহ্ম যিনি, তিনিই আবেস্তার অহুর মাজদা। আবেস্তায় বলা হয়েছে, আহুর মাজদা সর্বপ্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর জল, উদ্ভিদ ও প্রাণী। সর্বশেষে এনেছেন মানুষকে। উক্ত মতবাদটি আজকের বিবর্তনবাদের অনেকটা কাছাকাছি। ধরে নেওয়া যেতে পারে, মহাকাশে প্রথমে উত্তপ্ত পৃথিবীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাপ হারিয়ে একদিন হলো জলমগ্ন। জলেই প্রথম আসে জলজ উদ্ভিদ ও পরে জীব। অবশেষে ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করার পর মানুষ এসেছে।

মানুষের উৎপত্তি সমন্ধে চীনদেশেও সেকালে রচিত হয়েছিল একটি কাহিনী। চৈনিক পুরাণে উল্লেখ আছে, ফানকু নামে এক মহাশক্তিধর দেবতা কাদামাটি দিয়ে মানুষের মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকটা সেই গ্রীক পুরাণ কাহিনীর মত।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সুসভ্যদেশ ছাড়াও প্রাচীনকালে কিছু-কিছু আদিম মানব গোষ্ঠী মানুষের উৎপত্তি রহস্য ব্যাখা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাদের মধ্যে পলিনেশিয় আদিম মানবগোষ্ঠীর কল্পিত কাহিনী আবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানব সৃষ্টির মূলে এবা ঈশ্বরের কল্পনা করলেও কল্পনায় কিছু অভিনবত্ব আছে।

পলিনেশিয়দের মতে আদিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কিছু ছিলনা। চারদিকে ছিল মহাশূন্য। আর সেই মহাশূন্যের মধ্যে বিরাজ করছিল ঘন অন্ধকার। (বর্তমানের বৈজ্ঞানিক মতবাদও অনেকটা ঐ রকম। আরও মনে করা হয়, আদিতে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি এমন অকল্পনীয় ছিল না। প্রসারনের ফলেই আজকের এমন বিশাল মহাবিশ্ব।) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা সেই মহান শক্তিধর পুরুষ তথা অন্ধকারের মধ্যে প্রথম সৃজন করেছিলেন জড় পদার্থ। তারপর অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর মিলনে উৎপন্ন হয় গাছপালা ও জীবজন্তু। অবশেষে এসেছিলেন আদিপিতা পাপা ও আদি মাতা রঙ্গী। এঁদের দুজনের কাছ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী। (বিজ্ঞানীদের বিগ-ব্যাং মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও পিণ্ডাবদ্ধ হয়েছিল এক ধবণের আদিম কণিকা। তারপর প্রচণ্ড

এক বিস্ফোরণের ফলে পিণ্ডটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই থেকে ব্রহ্মাণ্ডও প্রসারিত হতে শুরু করে। পরে বিরল-ভাবে অবস্থানকারী সহস্র সহস্র কোটি মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ কণিকারা আভ্যন্তরীন অস্থিরতার দরুণ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে এক একটি নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সী। কোন কোন নক্ষত্র আবার জন্মলগ্নে লাভ করে সৌরজগৎ। সৌরজগতের বাসিন্দা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। এর আবহমণ্ডলে অবস্থানকারী জড় পদার্থ সমূহ থেকে জৈব যৌগ সংশ্লেষিত হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।)

পলিনেশিয়দের উপরোক্ত কাহিনীটিকে পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা যথেষ্ট সমাদর করে থাকেন। বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের সঙ্গেও আছে অনেকখানি মিল। তবু বিজ্ঞানীরা সেই মহান পুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না এবং স্বীকার করেন না আদি পিতা ও আদি মাতাকে।

পলিনেশিয়দের মত আরও বহু আদিম মানবগোষ্ঠী মানুষের উৎপত্তির মূলে স্রষ্টার কল্পনা করেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিমে মাই-ক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষের ধারণা অনেকটা বাইবেলে বর্ণিত আদম ও ইভের কাহিনীর মতই ছিল। এদের মতেও স্রষ্টার সৃষ্টির শেষ পর্বে এসেছে মানুষ।

উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একটা অন্তত বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন পুরাণ মানবসৃষ্টিকে জীব সৃষ্টির আগে স্থান দেয়নি। সবার মতে জীবসৃষ্টির একেবারে শেষপর্যায়ে এসেছে মানুষ। বিজ্ঞান কেবলমাত্র এই সত্যটি স্বীকার করলেও সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার খেয়ালকে স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের রাজ্যে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত ছাড়া শুধুমাত্র কল্পনার আদৌ স্থান নেই। যে চিন্তাধারা অন্ত-র্নিহিত কার্যকারণকে ব্যাখ্যা করতে পারে না সে চিন্তাকেও আমল দিতে চায়না। তাই কোন জটিল বিষয়কে স্রষ্টার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেনা বিজ্ঞান। স্রষ্টা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্ভর কোন তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সে প্রয়াসী হয়। উক্ত কারণে মানবসৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা

দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন এবং প্রবর্তন করেছেন বিবর্তনবাদ। তাঁরা মনে করেন, আদিম উত্তপ্ত পৃথিবীর আবহমণ্ডলে সংশ্লেষিত প্রথম জৈব যৌগ জলধারার সঙ্গে নেমে এসে সাগরে সঞ্চিত হয়েছিল প্রাণপঙ্করূপে। পরে সেখান থেকে উৎপন্ন হয় এককোষী জীব ও উদ্ভিদ। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় এককোষী থেকে বহুকোষী অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, জলচর থেকে উভচর ও পরে স্থলচর, ডিম্বপ্রসবী থেকে স্তন্যপায়ী, —এইভাবে একেবারে শেষ ধাপে এসেছে মানুষ।

এক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একটি কাহিনীর কথা অবশ্যই মনে পড়বে। সেটি ভগবানের অবতার বাদের কাহিনী। কোন কোন পুরাণে বলা হয়েছে ভগবানের তিনটি অবতার। আবার কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে অবতারের সংখ্যা ছয়, দশ, বাইশ, তেইশ ইত্যাদি। তবে সর্বক্ষেত্রে প্রথম তিনটি অবতার বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। তিন অবতার যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ। মহাভারতে এক জায়গায় বলা হয়েছে ভগবানের ছটি অবতার। অন্যত্র আবাব দশ অবতারের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের উক্তি অনুযায়ী ছটির পরিবর্তে-পাঁচটি অবতার তথা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতারের কথা গ্রহণ করলে জীবের বিবর্তনটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের যুগ, তারপরে সরীসৃপ ও উভচরদের যুগ, স্তন্যপায়ীর যুগ, অর্ধনর ও অর্ধবানরাকৃতি মানুষের যুগ এবং পরিশেষে আসে বেঁটে মানুষের যুগ। যাদের প্রতীক হিসাবে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামনকে চিহ্নিত করা যায়। তবে অবতারবাদের মাধ্যমে পুরাণ কারগণ জীবের বিবর্তনবাদ রূপকের সাহায্যে সত্যিই ব্যক্ত করেছিলেন কিনা—তা ঠিক করে বলা যায় না।

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আবার মনে করেন, অবতারবাদের কল্পনা আর্যঋষিদের বা পুরাণকারদের নয়। পূর্ব-ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসিন্দাদের কাছ থেকে আর্যঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, আর্যদের আগমনের বহুপূর্বে অবতারবাদের কল্পনা করেছিল ভারতের বাসিন্দারা।

তারা কতটি অবতারের কল্পনা করেছিল—তা জানা না গেলেও এমন একটি চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনার জন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। আর এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণারও প্রয়োজন ছিল।

মানুষ কি গ্রহান্তরের জীব ?

আজকাল কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মানুষকে গ্রহান্তরের জীব হিসাবের চিহ্নিত করে থাকেন। এঁদের মতে মানুষ জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায় আসেনি। এসেছে অন্য কোন গ্রহ থেকে। সে গ্রহ আমাদেরই সৌরজগতের কোন গ্রহ হতে পারে, অথবা এই সৌরজগতের বাহিরে অপর কোন গ্রহের বাসিন্দা ছিল ওরা। সেকালে তারা বিজ্ঞান বলে মহাকাশে বিচরণ করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু অথবা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তারা তাদের আবাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপর বাসপোযোগী কোন গ্রহের সন্ধানে অতি দ্রুতগামী মহাকাশযানে আরোহণ করে মহাকাশেই বিচরণ করতে থাকে। অবশেষে তারা সন্ধান লাভ করে পৃথিবীর। সেই থেকে তারা পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে দেয় এবং তাদেরই বংশ বিস্তারের ফলে আজকের এই বিশাল মানব-সমাজ।

উক্ত মতের সমর্থকরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের কল্পনার মূলে আছে বর্তমানে মানব নির্মিত অতিদ্রুতগামী মহাকাশযান! আজকের উন্নত মহাকাশবিজ্ঞানও যে তাঁদের উৎসাহ বর্ধন করেছে সে কথাও নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। ওরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন লৌকিক কাহিনী এবং পুরাণের গালগল্পগুলিকে সত্যকাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী।

প্রথমত তাঁরা বলতে চান, প্রাচীন মানবগোষ্ঠী গুহাগাত্রগুলিতে যে সব চিত্র অঙ্কন করেছিল তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নানাজাতীয় বিমানের চিত্র স্পষ্ট। যেহেতু মহাকাশে বিচরণ করার একমাত্র হাতিয়ার ঐ বিমানে করে তাদের পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে অবতরণ করেছিল। তাই অবসর সময়ে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তারা বিমানের ছবি আঁকতো। কেননা, বিমান তৈরির কৌশলটা তারা জানতো না এবং যে গ্রহ থেকে তাদের পূর্বপুরুষ বিমানে আরোহণ করে এসেছিল সেইখানেই ছিল বিমান নির্মানের কারখানা। অতএব পৃথিবীতে বিমান নির্মান সেকালে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত প্রাচীনকালের সব দেশের কাহিনীগুলিতে স্বর্গের উল্লেখ আছে। তাঁরা বলতে চান, স্বর্গ পৃথিবীর বাহিরে এমনকি আমাদের সৌরজগতেরও বাহিরে কোন একটি গ্রহ কিংবা উপগ্রহ। পুরাণসমূহের দেবতা বলতে ঐখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁরাই পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করেন আর কিছু জনকে ঐখানে স্থানান্তরিত করেন। আজকের পৃথিবীর মানুষের তুলনায় তাঁরা ছিলেন সহস্র সহস্র গুণে উন্নত। পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁরা যোগসূত্র রক্ষা করে চলতেন। বিশেষ করে নতুন আবাস গড়ে ওঠায় তাঁরা মাঝে মাঝে এসে উপদেশ প্রদান করতেন এবং কেউ বিপদে পড়লে তাকে রাক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। বিজ্ঞানে অসম্ভব রকমের উন্নতি করার জন্য কোন কাজ তাঁদের কাছে শক্ত ছিল না। ওঁরা স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করতেন এবং অমিত প্রতিভাধর ও অসাধারণ কর্মকুশল হওয়ায় সকলের কাছ থেকে পূজা পেতেন।

প্রথম যুক্তিকে অনেকে একেবারে অবান্তর বলে মনে করেন। গুহা মানবরা ছিল একেবারে কাজের মানুষ। তারা মনের খেয়ালে ছবি আঁকতো না বা স্মৃতি রোমন্থন করতো না। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অহরহ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হতো। মুখে তাদের ভাষা ছিলনা। লিখতেও জানতো না। ছবির মাধ্যমে আপন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতো এবং অল্প বয়স্কদের শিক্ষাদান করতো। ডালপালা—পাখী ইত্যাদি অনেক কিছুর ছবি আঁকতে হতো তাদের। অন্যদিকে ছবিগুলি বেশ অস্পষ্টও। সেগুলি প্রকৃত বিমানের ছবি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে এত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, বিমানের একটা টুকরা অথবা কোন যন্ত্রাংশ গুহা মানবদের গুহা থেকে আবিষ্কৃত

হয়নি। অথচ তাদের ব্যবহৃত গুহাগুলি দেখে বেশ বোঝা যায়, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে জানতো না, পশুচর্ম পরিধান করতো, আগুনে ঝলসানো মাংস খেয়ে জীবনধারণ করতো। পাথর ছাড়া কোন একটি ধাতুর টুকরাও দেখা যায়নি। এমন কি এক কণা শস্যও পাওয়া যায়নি। অতএব তারা যদি অন্য গ্রহের অতি বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞানে উন্নত জীব ছিল তাহলে অনুরূপ জীবনযাত্রা প্রণালীতে কেন রপ্ত হয়েছিল? তাছাড়া ঐ সময়টাতে পৃথিবীতে চলছিল ভয়ঙ্কর তুষার যুগ। ঐ ভয়ঙ্কর পরিবেশে কেন তারা বসবাস করতে শুরু করলো? তাছাড়া তাদের সেদিন যে চেহারা ছিল—তা পৌরাণিক কাহিনীগুলির মানুষ, দৈত্য-দানব কারও সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি, স্বর্গ ও দেবতা সম্বন্ধেও আছে যথেষ্ট সংশয়। দেবতাদের প্রিয় স্বর্গ কি মহাকাশের কোন গ্রহ কিংবা উপগ্রহ? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীর মানুষ দেবতাদের রাজ্যে কেমন করে হানা দিত? অথচ দেবতাদের মত ওদের কোন মহাকাশ যান ছিল না।

বর্তমানের সমালোচকরা স্বর্গ নামক স্থানটিকে মহাকাশে স্থান দিতে চান না। কারণ অবশ্য অনেক আছে। কোন দেশের কোন পৌরাণিক কাহিনী স্বর্গের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করেনি। হিন্দু পুরাণ-গুলিতো স্পষ্ট হিমালয়কে দেবতাদের আবাসস্থল রূপে চিহ্নিত করেছে।

যদি দেবতারা বাহিরের গ্রহ থেকে আসতেন তাহলে কতদিনে তাঁরা পৃথিবীতে পৌঁছতেন? সূর্যের অন্য কোন গ্রহে কিংবা উপগ্রহে কোন উন্নত জীবের বাসস্থান কোনদিনই ছিল না বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। চন্দ্রতো জন্ম থেকে মৃত। গ্রহগুলির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা এমন যে তাতে কোন উন্নত জীবের অবস্থান সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর উন্নত জীব মানুষের সহ্য সীমা ০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন, উক্ত তাপমাত্রার নিম্নে কিংবা ঊর্ধ্বে কোন উন্নত জীব বাঁচতে পারে না। বর্তমানে গ্রহগুলির যে সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে জানা গেছে বুধ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৮০° সে. থেকে ৪০০° সে., শুক্রের ৪০০° সে.

এবং আবহামণ্ডলের চাপ পৃথিবী ৯০ গুণ, বৃহস্পতি এবং তার উপগ্রহদের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১২৫° সেন্টিগ্রেডের নিচে, শনি ও তার উপগ্রহদের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১৭০° সেন্টিগ্রেডের নিচে, অন্যান্য গ্রহদের আরও কম। কেবল মঙ্গল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা উন্নত জীবের সহ্য সীমার মধ্যে। কারও কারও বিশ্বাস, মঙ্গলে এখন চলছে তুষার যুগ। তবে কি ঐ মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষের আগমন হয়েছে পৃথিবীতে ?

মঙ্গল সম্বন্ধে চিরকালের এক বিতর্ক। কল্প বিজ্ঞানের গল্পগুলিতে মঙ্গলগ্রহের উন্নত জীবগোষ্ঠী সম্বন্ধে ফলাও বর্ণনা মানুষের মনে দীর্ঘকাল রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে আসছে। অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন, মঙ্গলে তুষার যুগ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে সেখানকার উন্নত জীবরা পালিয়ে এসেছে পৃথিবীতে।

এমন ভাবনারও কোন হেতু নেই। পার্থিব জীব মাত্রই কারবন ভিত্তিক। অর্থাৎ তার গঠনের মূলে আছে কারবন নামক মৌলিক পদার্থটির নানা রকমের যৌগ। ঐ যৌগগুলির মধ্যে আবার কারবন ব্যতীত মাত্র ১২টি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহের জীব পার্থিব জীবের দেহোপাদানের সমান কিছুতেই হতে পারেনা। অপরদিকে মঙ্গল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকেনা। কাছে এলে ৩'৪ কোটি মাইল এবং দূরে গেলে হয় ২৫ কোটি মাইল। সেখানে যদি দেবতারা থাকতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষের ডাক তাঁদের কাছে কেমন করে পৌঁছাতো ? নাকি আজকের মত যোগাযোগকারী কয়েকশত কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীকক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল ? তাই যদি হয় কত দ্রুত সেই যান বা বিমান—যার দ্বারা চক্ষের পলকে তারা আহ্বানকারীর সম্মুখে আবির্ভূত হতেন ? আলোকের বেগে সোজাসুজি ছুটে এলেও আপাতত তিন থেকে চব্বিশ কিংবা পঁচিশ মিনিট সময় লাগার কথা। অপর সৌরজগৎ থেকে অর্থাৎ সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্রের কোন গ্রহ (?) থেকে যদি আসতেন তাহলে তিনবছরের বেশী সময় লাগার কথা। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান জানিয়েছে বেগবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের পরিমাপ কম হয়ে আসে। তবে এও জানিয়েছে যে ;

কোন কিছুর গতিবেগ আলোকের গতিবেগের বেশী হতে পারেনা।

অপরপক্ষে তাঁদের যান বলতে যে কি তাও সঠিক করে কেউ বলছেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কেবলই কল্পনার জাল বিস্তার করছেন। হিন্দু পুরাণগুলিতে আছে ব্রহ্মার রথ হংসদ্বারা চালিত হতো, রাবণের পুষ্পক রথ টানতো ভূতেরা, বিশ্বকর্মা ভমি অস্ত্র দিয়ে সূর্য থেকে কয়েকটা টুকরা কেটে এনেছিলেন এবং তার দ্বারা তৈরি করেছিলেন সেই পুষ্পক বিমান ইত্যাদি। আজকের দিনে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি কি ওতে আস্থা স্থাপন করতে পারবেন! আরও একটি কথা, তাঁরা যদি পরমাণুবিজ্ঞানে এত উন্নত ছিলেন, টেলিভিসন, বেতারবার্তা, ইলেক্ট্রনিকস প্রভৃতিতে এত উন্নত ছিলেন এবং পৃথিবীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন, তাহলে তার কি কোন চিহ্ন থাকতো না? কোটি কোটি বছর আগেকার কত জীবাশ্ম তো পাওয়া যাচ্ছে আজকাল আর পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন-কালে মানুষের ব্যবহৃত কত জিনিসপত্র। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞানের কোথাও কোনও নির্দশন পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, মহাকাশে বিচরণ করার সহস্র বাধা। সেইসব বাধাকে কেমন করে অতিক্রম করেছিল? গুহাগাত্রে ধরা গেল বিমানের ছবি আছে, কিন্তু কোন মহাকাশচারীর কি ছবি আছে? পুরাণ-গুলিতে বিমানের কথা আছে কিন্তু মহাকাশের বাধা বা মহাকাশচারীর পোষাকের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। অনেকে ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত ত্রিশঙ্কুর কথা উল্লেখ করতে পাবেন। ঋষি বিশ্বামিত্র যোগবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গপানে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝখানে ত্রিশঙ্কু থেমে যান এবং সেখানে রচিত হয় নতুন এক স্বর্গ। কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যায় ধরা হয় ত্রিশঙ্কু যেখানে থামতে বাধ্য হয়েছিলেন সেখানে পৃথিবীর আকর্ষণবল শূন্য।

আজকের দিনেই মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের পরই অনুরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। কিন্তু পুরাণ থেকে এই সত্যের হদিশ পাওয়া যায়না কিংবা পাওয়া যায় না ত্রিশঙ্কু কেমন ধরণের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ধাবিত হয়েছিলেন। উক্ত কাহিনী থেকে কি ধরে নিতে হবে নতুন একটি গ্রহও (স্বর্গ যদি একটি গ্রহ হয়) সেদিন সৃষ্টি করা সম্ভব

হয়েছিল? তাহলে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ নামক স্থানটি মহাকাশে কোথায় অবস্থান করছে?

এতএব মানুষ যে গ্রহান্তরের জীব—এই সত্য বর্তমানে আদৌ সমর্থন করা যাচ্ছে না। যদি কোনদিন তেমন জোরালো কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় তাহলে সেদিন বিবেচনা করা যাবে। আজ যখন কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছেনা তখন পুরাণের কাহিনীকে আমরা ইতিহাস না বলে সাহিত্য ও দর্শন হিসাবে গণ্য করবো। তাই মানুষকে গ্রহান্তরের জীব বলে মনে করার কোন কারণ বর্তমানে দেখা যায় না। অপর পক্ষে আদিমানবের যেসব মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে যে অংশটিতে মস্তিষ্ক থাকতো তার পরিসরটা আজকের মানুষের তুলনায় অনেক কম ছিল। এই ধরণের মস্তিষ্ক এত উন্নত চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে পারেনা!

মোটকথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুযায়ী ধরতে হবে, মানুষ গ্রহান্তরের জীব নয়। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, অণ্ডজ থেকে স্তন্যপায়ী, তারপর ক্রমবিকাশের ধারায় স্তন্যপায়ীদের সর্ব শেষ ধাপে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয় বানর জাতীয় প্রাণী। ওরাও নিজেদের ঠিক রাখতে পারেনি। প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে বিভক্ত হয়ে পড়ে নানা শাখায়। ওদের কোন একটি শাখা থেকে উদ্ভব হয়েছিল অর্ধবানরাকৃতি মানুষ। পরিশেষে বিবর্তনের একেবারে শেষধাপে এসেছে মানুষের পূর্বপুরুষ।

বিবর্তনবাদের সপক্ষে বিজ্ঞানীদের বড় যুক্তি নানা স্থানে প্রাপ্ত আদি মানবের দেহাস্থি, তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে ওদের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত এদের মাথার খুলি, দেহের হাড় ইত্যাদিকে তুলনা করে বিবর্তনের সপক্ষে রায় দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, মানুষও যে পৃথিবীর জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের ধারায় আবির্ভূত হয়েছে—এই সত্যটিকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর

বুকে যে সব প্রাণী এসেছে তাদের কিছু কিছু চিহ্নও হস্তগত করেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বেশ কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে বিবর্তনটা একেবারেই স্পষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে সমস্ত স্তরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত না হলেও যতটুকু পাওয়া গেছে তাও বড় কম নয়। এতএব মানুষের আগমনের সপক্ষে বিজ্ঞানীদের যুক্তিই জোরালো। গ্রহান্তরের উন্নত জীব হিসাবে তাঁরা মানুষকে মনে করতে সম্মত নন।

আদি মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত।

মানুষের উৎপতি সম্বন্ধে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ করছেন। কেউ বলছেন আদি এক মানব দম্পতি থেকে আজকের মানবগোষ্ঠী, কেউ বা মনে করেন মানুষ গ্রহান্তরের উন্নত জীব। তাই যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাষাগত মিল অন্ততঃ কিছুটা থাকতো।

আগে বিজ্ঞানীরাও মনে করতেন, পৃথিবীর সব মানুষই এসেছে একটি সাধারণ উৎস থেকে। এককালে ওদের ভাষা একই ছিল। কালক্রমে অঞ্চলভেদে ভাষা লোকমুখে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের সহস্র লহস্র ভাষা।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত মন্তব্য কিছু পরবর্তীকালে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বানর জাতীয় জীব থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানব গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে বটে, তথাপি চিরকাল ধরে একটি বিশেষ ধারা অব্যাহত নেই। কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে সেই বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর থেকে কত যে অসংখ্য শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে তা কল্পনার মধ্যেও যেন আনা যায় না। এক শাখা থেকে কালক্রমে উদ্ভব হয়েছে শত শত শাখা। সে গুলির অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। কেবল দু একটি কোন প্রকারে টিকে গেছে। যারা টিকে গেছে তাদের মধ্যেও উদ্ভব হয়েছে নানা শাখা। আবার সেগুলিরও অধিকাংশ শাখা কালের কুটিল গতিতে লুপ্ত হয়ে গেছে। এইভাবে চলেছিল আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর থেকে ক্রোমাগনন মানুষ পর্যন্ত প্রায় তিন কোটি বছর পর্যন্ত। ঐ

ক্রোমাগনন মানুষের (আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ) কালেও টিকে ছিল বহু শাখা এবং নানা পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তখনও তাদের মুখে ভাষা আসেনি আরও পরে দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ভাষার সৃষ্টি করেছিল।

পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর উৎস খুঁজতে গিয়ে একদিন ভাষা-তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং পৃথিবীর যেখানে যত ভাষাভাষী মানুষ আছে প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে ধ্বনি গত সাদৃশ্য খুঁজতে যত্নবান হয়েছিলেন। তাঁরাও প্রথম মনে করেছিলেন, আদি মানবগোষ্ঠী একটি বিশেষ উৎস থেকে আগমন করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। অঞ্চল ভেদেই তাদের চেহারার মধ্যে ও ভাষার মধ্যে এসেছে নানা পরিবর্তন। তবু সহস্র সহস্র বছরের ব্যবধানেও মূল ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বজায় আছে।

বহু অনুসন্ধানের পর তাঁরা লাভ করেছেন প্রায় হাজার তিনেকের মত ভাষা। যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৪৫০ কোটি সেখানে দেখা গেছে কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা দু-এক শয়েরও বেশী নয়। ধ্বনিগত সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর এই বিপুল জনসংখ্যাকে তিন হাজার ভাষাভাষীতে এবং ঐ তিন হাজার ভাষাকে মাত্র ২৬টি পরিবারে বিভক্ত করেছেন। ২৬টি পরিবার যথাক্রমে (১) ইন্দো ইওরোপীয় (২) ভোট চীনীয় (৩) জাপানী ও কোরিয় (৪) সেমীয় হামিটিক (৫) হাইপারবেরিয়ান (৯) এস্কিমো (১০) আইবেরো বাস্ক (১১) এশিয়াটিক (১২) দ্রাবিড় (১৩) আন্দামানী (১৪) অস্ট্রোএশিয় (১৫) বুরুশাসকী (১৬) লা-তি (১৭) তাসমানীয় (১৮) পাপুয়ান (১৯) সুদানী গিনীয় (২০) অস্ট্রেলীয় (২১) অস্ট্রোনেশীয় (২২) বান্টু (২৩) হটেনটট বুশম্যান (২৪) নর্থ আমেরিকান (২৫) সাউথ আমেরিকান এবং (২৬) মেক্সীকীয়।

ছাব্বিশটি ভাষা পরিবারের মধ্যে একমাত্র ইন্দোইওরোপীয় ভাষা পরিবারের লোকই সর্বাধিক। উক্ত পরিবারের মধ্যে পড়ে গ্রীক, ল্যাতিন, সংস্কৃত, ইংরাজী, গথিক প্রভৃতি কত ভাষা! কালক্রমে উক্ত ভাষাগুলি থেকে আবার উদ্ভব হয়েছে কত হরেকরকমের ভাষা। যেমন সংস্কৃত

থেকে জন্মলাভ করেছে প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলি। তাই পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধাংশের কিছু কম লোক উক্ত ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত।

ইন্দোইওরোপীয় ভাষা পরিবারের পরেই ভোট চীনীয় ভাষাপরিবারের স্থান। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক ভোটচীনীয় ভাষা পরিবারের। অপরাপর ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত যারা তাদের সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ বাদবাকি এক চতুর্থাংশ লোক চব্বিশটি ভাষা পরিবারের মধ্যে পড়ে। কয়েকটি পরিবারে আছে আবার কয়েক হাজার থেকে মাত্র কয়েকশ মানুষ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সুসভ্য মানুষ বিশেষ একটি কিংবা দুটি আদিমগোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন। ইন্দোইওরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষ যেহেতু বেশী তাই এর উৎস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে আদিম গোষ্ঠীর পরিচয় পেয়েছেন তারাই ক্রোমাগনন মানুষ। ঐ গোষ্ঠীর লোকেরা আপন শক্তি বলে অন্যান্য গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। পরাজিতরা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে, কিছু কিছু বা অরণ্যে অরণ্যে আত্মগোপন করে। ওদের কয়েকটি গোষ্ঠীমাত্র সভ্যতার আলো পেয়েছিল। আর অন্যান্যরা তেমনই আদিম জীবনযাত্রা প্রণালীতে অভ্যস্ত হয়ে রইল।

ক্রোমাগনন মানুষদের আদিবাসস্থান সম্ভবত কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের উত্তরতীরে ও মধ্যবর্তী ভূভাগে দানিয়ুব নদীর উপত্যকায়, হাঙ্গেরীর সমভূমিতে, স্কাণ্ডিনেভিয়া ও জার্মানীতে ছিল। ওরা সংখ্যায় বেশী হলেও মানবগোষ্ঠী যে একটিমাত্র উৎস থেকে আসেনি তা বেশ ভালভাবেই প্রমাণ করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদরা।

বিবর্তনবাদের সপক্ষে বিজ্ঞানীদের যুক্তি এবং জীবাশ্ম

বিজ্ঞানীরা কল্পনাকে আদৌ প্রাধান্য দান করেন না। বহু বছরের বহু গবেষণালব্ধ ফল থেকে সমর্থিত হয়েছে বিবর্তনবাদ। উক্ত মতবাদ-টিকে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে বিজ্ঞানীরা যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করেছেন,

সেটির নাম "জীবাশ্ম"। পৃথিবীর বুকে বিভিন্নস্থানে লুকিয়ে থাকা প্রাণীদের জীবাশ্ম প্রমাণ করেছে, পৃথিবীতে চিরকাল একই ধরনের জীব-জগৎ ও উদ্ভিবজগৎ বিরাজ করছে না। পৃথিবীর প্রায় চারশ কোটি বছরের জীবনে কী জীব কী উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যে এসেছে নানাপরিবর্তন। সে পরিবর্তন আবার এসেছে পৃথিবীর পরিবেশকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর পরিবেশটাও চিরকাল একই অবস্থায় নেই। আদিম পৃথিবী ছিল অতিশয় বিক্ষুব্ধ। সে সময় পৃথিবীর বুকে নামতো ঘন ঘন দুর্যোগ। চলতোও দীর্ঘকাল ধরে। ফলে হারিয়ে গেছে কত জীব আর কত উদ্ভিদ।

বিজ্ঞানীরা আরও বিশ্বাস করেন ; মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে নেমে আছে তুষারযুগ। উক্ত সময়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ বরফে বরফে ঢাকা পড়ে যায় এবং এটি স্থায়ী হয় লক্ষ লক্ষ বছর কাল। ঐ সময়কে বিজ্ঞানীরা এক অতি ভয়ঙ্কর সময় হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। কারণ তুষারযুগের মধ্যে হারিয়ে যায় সব কিছু পুরাতন এবং আগমন সূচিত হয় নতুনের। আদিতে ঐ যুগ হানা দিতো ঘন ঘন। পরে বেশ বিলম্বে আসতে শুরু করে। তাই আদি থেকে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ যেমন টিকে থাকতে পারেনি, তেমনই জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারাটিও বজায় থাকতে পারেনি চিরকাল। যদি দুর্যোগ না আসতো তাহলে হয়ত অনেক পূর্বেই এসে যেতো মানুষ।

মানুষের কালেও তুষারযুগ হানা দিয়েছিল। উক্ত কারণে হারিয়ে গেছে ওদের অনেক প্রজাতি। যারা কোনরকমে টিকে ছিল, তারাও নিজেদের অবিকৃত রাখতে পারেনি। দৈহিক পরিবর্তন অনেক হয়েছে। সর্বশেষে তুষারযুগের পরে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগেই এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষ।

কালে কালে নতুন জীব এসেছে, আবার হারিয়েও গেছে। কিন্তু পৃথিবী ভুলেনি তাদের। মমতাময়ী জননীর মত সর্বকালের সমস্ত সন্তানের স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধারণ করে আছে। বুদ্ধিমান মানুষ মাটি খুঁড়ে লাভ করেছে সেইসব নিদর্শন—তথা প্রাচীন জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। এককথায় ঐ গুলিকেই বলা হয় জীবাশ্ম

অনেকের ধারণা, খ্রীষ্টজন্মের আগেই মানুষ জীবাশ্মের পরিচয় লাভ করেছিল। কিন্তু জীবাশ্ম সেদিন তার মনে কোন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পারেনি পরে জেনোফেন নামে এক বিজ্ঞানীই প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা আদিম জীবের নিদর্শন লাভ করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। জেনোফেনের পরে কেটে গেছে কতকাল। বিভিন্ন বিজ্ঞানী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে লাভ করেছেন কত সহস্র সহস্র প্রাচীন জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত দেহ, কঙ্কাল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে উক্ত নিদর্শন-গুলিই মানুষের পুরাতন ধারণাকে নস্যাৎ করে প্রতিষ্ঠিত করেছে আধুনিক মতবাদ। এক কথায় সেই যে প্রাচীন ধারণা, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিরাট পুরুষের দ্বারা জীব সৃষ্টি অথবা অজৈব পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে জীব, মানুষের এই ধারণাগুলি গল্প কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন, জীবাশ্ম কী? কেমন করে টিকে আছে পৃথিবীর বক্ষ পিঞ্জরের মধ্যে?

উত্তরে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, পৃথিবীর উপরিভাগে যুগ যুগ ধরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে মাটি, চুন, বালি, পলি প্রভৃতি! সেই কোন আদিকাল থেকে পৃথিবীর বুকে জমা হয়ে আসছে পাললিক শিলাস্তর। প্রত্যেকটি স্তরে আবার জমা পড়েছে সেই যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ ও দেহাবশেষ। দীর্ঘকাল ধরে শিলাস্তরের মধ্যে আটক থাকায় পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপের ফলে চাপা পড়া জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে এসেছে নানা রূপান্তর। ফলে কেউ একেবারে প্রস্তরী-ভূত হয়ে পড়েছে, কেউ মুদ্রিত করে গেছে আপনার চিহ্নটুকু, আবার কেউবা বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ লাভ করার জন্য একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থেকে গেছে। অতীতদিনের সেইসব জীব ও উদ্ভিদের দেহাব-শেষকেই বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন জীবাশ্ম বা ফসিল।

বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, জীবাশ্ম সৃষ্টির মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। ফলে নানাস্থানে সন্ধান পাওয়া গেছে জীবাশ্মের। কোথাও পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের জীবদেহের সম্পূর্ণ অবয়বখানা, কোথাও প্রাণীদের পায়ের ছাপ, কোথাও কেবল কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা

এমন অনেক উপায় আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা প্রাচীনকালের কোন জীবদেহের সামান্য দু একখানা কঙ্কাল হাতে নিয়েই বলে দিতে পারেন আস্ত জীবটি কেমন ধরনের ছিল, কেমন করে হাঁটতো, কি খেতো ইত্যাদি অনেক কথা। তাঁদের পরীক্ষাগুলো এতই নির্ভুল যে, সিদ্ধান্তের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার পদ্ধতিগুলি এমন নিখুঁত যে, কোন একটি জীবের মাত্র একখানি কঙ্কাল লাভ করে বিজ্ঞানীরা সেই জীবের একটি ছবির কল্পনা করে থাকেন। পরে যখন অপর কোন এক জায়গা থেকে সেই জীবটির আস্তদেহ-খানা উদ্ধার করা সম্ভব হয় তখন দেখা যায় ছবির সঙ্গে জীবটির একেবারে হুবহু মিল। এমন ঘটনা বহু ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে।

যে যে কারণে জীবদেহ প্রকৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়ে জীবাশ্মে রূপান্তরিত হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কয়েকটা মতবাদ রেখেছেন। মতবাদগুলি নিম্নে প্রদান করা গেল।

১। **সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম—**

বরফ জীবদেহের একটি ভাল সংরক্ষক। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে অথবা চির তুষারাবৃত কোনস্থানে যদি কোন কারণে কোন জীবদেহ বরফের তলায় চাপা পড়ে যায় তাহলে সুদীর্ঘকাল ধরে সে একেবারে অক্ষত অবস্থাতেই থেকে যায়। দেহের কোনরূপ বিকৃতিও হয়না এতটুকু। বিজ্ঞানীরা এমন স্থানের নাম দিয়েছেন "প্রকৃতির হিমঘর"।

কোটি কোটি বছর আগে যারা পৃথিবীতে বিচরণ করতো তাদের দু চারটি অসাবধানতার ফলে হোক, কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে হোক, একদিন চাপা পড়েছিল তুষার স্তূপের মধ্যে। আশ্চর্যের কথা তাদের আস্ত দেহগুলো এখনও পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উত্তর সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে এখনও সংরক্ষিত আছে অতি প্রাচীন-কালে আবির্ভূত বহু প্রাণীর দেহ। প্রমাণ স্বরূপ, উক্ত অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় কোন সময়ে বরফ ফেটে গেলে মাঝে মাঝে দু একটা অতিকায় লোমশ হাতী বা ম্যামথের দেহ আত্মপ্রকাশ করে। লোমশ

হাতী বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও নেই। বিজ্ঞানীদের অনুমান, কয়েক কোটি বছর আগে ওরা ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে হোক অথবা পরে হোক, যারা বরফের তলায় সেদিন চাপা পড়েছিল তাদের দেহটা একেবারে সংরক্ষিত হয়েই আছে। একটা লোমও পর্যন্ত বিনষ্ট হয়নি। কোটি কোটি বছর আগে মারা গেছে অথচ দেখলে মনে হয় যেন সদ্য মৃত। এমনও দেখা গেছে, বরফের স্তূপ থেকে একটি ম্যামথের দেহ আত্মপ্রকাশ করলেই তাকে খাওয়ার জন্য ভিড় করে ক্ষুধার্ত কুকুর ও নেকড়েরা। সেখানকার অধিবাসীরাও একটি ম্যামথের দেহকে লাভ করলে আনন্দিত হয় এবং রান্না করে খায়। এমন অক্ষত আছে তাদের শরীর।

বরফের মত জীবদেহের আর একটি ভাল সংরক্ষক হলো অ্যাম্বার। পাইন জাতীয় এক ধরণের উদ্ভিদদেহ থেকে যে রেসিন নিঃসৃত হয় সেই রেসিনই একদিন পরিণত হয় অ্যাম্বারে। তারপর যুগ যুগ ধরে সে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। উক্ত কারণে লক্ষ লক্ষ বছর এমনটি কোটি কোটি বছর আগে একদিন যে সব পতঙ্গ বিশ্রাম করতে এসে কোমল ও আঠালো অ্যাম্বারের গায়ে আটকা পড়েছিল তারা তেমনই অক্ষত অবস্থায় আছে। গাছ থেকে রেসিন নিঃসরণ অব্যাহত থাকায় কালক্রমে নতুন রেসিনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলেছে পতঙ্গ-দের। পরে রেসিন শক্ত হয়ে অ্যাম্বারে পরিণত হয়েছে আর অতীতের সেই পতঙ্গদেহ তার মধ্যে তেমনই থেকে গেছে। দেখলে মনে হয়, যেন একেবারে জ্যান্ত পতঙ্গ। শোনা যায়, অ্যাম্বারের ভেতর থেকে বিজ্ঞানীরা প্রায় দু হাজার প্রজাতির মত পতঙ্গ আবিষ্কার করেছেন। অথচ এই সব পতঙ্গের বর্তমানে কোন চিহ্ন মাত্র নেই পৃথিবীতে।

মোট কথা, বরফের স্তূপ থেকে বিজ্ঞানীরা লাভ করছেন অতীতদিনের সম্পূর্ণ জীবদেহ আর অ্যাম্বারের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছেন পতঙ্গ দেহ। উভয়ই অবিকৃত অবস্থায় থেকে যাওয়ায় সুদূর অতীতের প্রাণী ও কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সবার মনে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

২। পেট্রিফিকেসন—

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, পেট্রিফিকেসন পদ্ধতিতেই বেশির ভাগ জীবাশ্ম সৃষ্টি হয়ে অবস্থান করছে পৃথিবীর বুকে। অতীত দিনের সর্বশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কাউকে না কাউকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মাটির তলায় চাপা পড়তে হয়েছে। তাদের দেহের কোমল অংশগুলি মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং কালক্রমে নষ্টও হয়ে গেছে! কিন্তু কঠিন অংশের কোন ক্ষয়ক্ষতি হতে পারেনি। পূর্ববৎ একেবারে অক্ষত অবস্থায় থেকে গেছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, জলচর এবং স্থলচর উভয় ধরণের প্রাণী জলে নিমজ্জিত হয়ে কোমল পলিমাটির স্তরে আটকা পড়ে গেছে। তারপর যুগের পর যুগ ধরে তাদের দেহের উপর সঞ্চিত হয়েছে পলিমাটি। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে অথবা স্বাভাবিক কারণেই মৃতদেহে উৎপন্ন হয়েছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। জলের সঙ্গে মিশ্রিত নানাবিধ খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থ সেই সব ছিদ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং কণায় কণায় সঞ্চিত হয়েছে দেহের মধ্যে। খুব মন্থর গতিতে উক্ত ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকায় কালক্রমে জীবদেহ রূপান্তরিত হয়ে গেছে অজৈব এক শিলায়।

যে সমস্ত খনিজ পদার্থ জীবদেহটির স্থান দখল করে আছে সেগুলি সাধারণতঃ আয়রন পাইরাইটিস, ফেরিক অক্সাইড, সালফার, ম্যালাকাইট, ম্যাগনেসাইট, সিলিকা এবং কারবন। এই অজৈব পদার্থগুলিই প্রকৃতপক্ষে মূল জীবদেহের স্থান দখল করায় দেহের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও মূল দেহটির অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত পদ্ধতিতে জীবাশ্মে পরিণত হওয়াকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন পেট্রিফিকেসন। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পেট্রিফিকেসন পদ্ধতিটি অতি ধীর ও মন্থর গতিতে সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা হিসেব করে জীবাশ্মটির বয়সও অতি সহজে নির্ণয় করে থাকেন।

৩। মোল্ড এবং কাস্ট পদ্ধতি—

নানা প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় মৃত্যুর পরে জীবদেহ মাটি বা বালির তলায় চাপা পড়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে তার উপর জমতে থাকে মাটি কিংবা বালির স্তর। সহস্র সহস্র বছর ধরে মাটির তলায় অবস্থান করার জন্য পরিবেশের চাপ ও আভ্যন্তরীণ তাপের প্রভাবে জীবদেহের চতুপার্শ্বস্থ নরম মৃত্তিকা একদিন কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেহেতু জীবদেহটি সেই নরম মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একদিন স্থান লাভ করেছিল তাই পরবর্তীকালে উৎপন্ন কঠিন শিলায় দেহের একটি অবিকল ছাপ থেকে গেছে। অথচ মূল দেহটি নানা প্রাকৃতিক কারণে কবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। শিলার বুকে এই ধরণের স্থায়ী ছাপকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন মোল্ড।

মোল্ড অনেক সময় সিলিকা কিংবা চুনাপাথরে পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ চারদিকে কঠিন শিলা আর মাঝখানে জমাট বাঁধা সিলিকা কিংবা চুনাপাথর। আম আঁটির উপর শক্ত আবরণে থাকে আঁটির ছাপ। এই জাতীয় জীবাশ্মকে পণ্ডিতেরা কাস্ট বলে থাকেন।

কাস্ট হস্তগত হলে বিজ্ঞানীরা কাস্টের ভেতরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে দেন। তখন কাস্ট মধ্যস্থিত সিলিকা কিংবা চুনাপাথর উক্ত অ্যাসিডের মাধ্যমে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তখন তাঁরা লাভ করেন জীবদেহ কিংবা উদ্ভিদদেহের প্রকৃত ছাপ।

অনেক সময় শঙ্খ প্রভৃতি চুনাপাথরের শক্ত আবরণ যুক্ত প্রাণীর ও ছাপ পাওয়া যায় শিলাস্তরে। কিন্তু আস্ত প্রাণীর দেহ পাওয়া যায় না। বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত কারবন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে অনেক সময় বিক্রিয়া ঘটিয়ে কারবনিক অ্যাসিড নামে একটি ক্ষীণ অ্যাসিড উৎপন্ন করে থাকে। সেই অ্যাসিড জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অপরপক্ষে ভূগর্ভেও আছে কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। বৃষ্টির জল পৃথিবীর উপরিস্থিত ফাটল দিয়ে নিচে নামার সময় ও পরিবেশের কারবন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কারবনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে শঙ্খ প্রভৃতির

খোলস দ্রবীভূত হয়ে যায় আর থেকে যায় কেবল প্রাণীদেহের ছাপ।

৪। **পায়ের ছাপ**—

অনেক সময় নদীতে জল পান করতে এসে প্রাণীরা নদী-তীরের কোমল মৃত্তিকায় নিজের পায়ের ছাপ মুদ্রিত করে দিয়ে যায়। বিশেষ পরিবেশের গুণে অনেকসময় তাদের পায়ের ছাপ সমেত সেই কোমল মৃত্তিকা ধীরে ধীরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এই ধরণের পায়ের ছাপযুক্ত শিলা লাভ করলে তার উপর প্লাস্টার অব প্যারিস ঢেলে দিয়ে আস্ত জীবের পায়ের নিম্নাংশকে নিখুঁত ভাবে লাভ করতে সমর্থ হন। আরও মজার কথা, পায়ের চিহ্ন দেখে এবং পায়ের ছাপ গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা প্রাণিদেহের আকার, ওজন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সব কিছু তথ্যই সংগ্রহ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের প্রদত্ত তথ্যগুলি সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

৫। **কপ্রোলাইট**—

অস্থি কিংবা পায়ের ছাপের মত কোন কোন জায়গায় প্রাণী কর্তৃক পরিত্যক্ত বিষ্ঠাও বিশেষ পরিবেশ লাভ করায় জীবাশ্মে পরিণত হয়ে থেকে গেছে। অপরদিকে এও দেখা গেছে যে মৃতপ্রাণীর অন্ত্রনালীতে আবদ্ধ বিষ্ঠাকুণ্ডলীটি কেবলমাত্র জীবাশ্মে পরিণত হয়ে গেছে অথচ মূল-প্রাণীটির কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না। উক্ত বিষ্ঠা বা বিষ্ঠাকুণ্ডলীর জীবাশ্মকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন কপ্রোলাইট। কপ্রোলাইট আমাদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ মনে হলেও বিশেষজ্ঞরা ওকে আদৌ তুচ্ছ করেন না। এমন কতকগুলি পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা ঐ বিষ্ঠার জীবাশ্ম থেকেই বলে দিতে পারেন, আসল প্রাণীটি দেখতে কেমন ছিল, লম্বা চওড়ায় কত, এমনকি স্বভাবটাও কেমন ছিল তাও বলে দিতে পারেন। একটা বড় রকমের আশ্চর্য, কোটি কোটি বছর আগে প্রাণীদের পরিত্যক্ত বিষ্ঠা এখনও কোথাও কোথাও পরিবেশের গুণে টিকে আছে।

জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়

এখন একটা প্রশ্ন আসে, পৃথিবীর বুকে না হয় জীবাশ্ম পাওয়া গেল কিন্তু ঐ জীবাশ্মের বয়স কত অথবা কবে কোন কালে প্রাণীটি আবির্ভূত হয়েছিল, তা জানা যায় কেমন করে? কোন যুক্তিতে বিজ্ঞানীরা কোন কোন জীবাশ্মকে কোটি কোটি বছর আগেও স্থান দিয়ে থাকেন?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর উপরিভাগে মাটি, চূন, বালি প্রভৃতি স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে। যেহেতু কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে শিলার ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয়ীভূত শিলা বায়ুপ্রবাহ ও নদীপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে সমুদ্র এবং হ্রদের তলদেশে। যুগ যুগ ধরে চলছে এই সঞ্চয়ের কাজ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা স্তরবিন্যাস। এই স্তরগুলিও অবিকৃত নেই। ভূগর্ভের চাপ ও তাপের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে নানাবিধ শিলায়।

যুগে যুগে সেই বালি ও কাদার স্তূপের মধ্যে আবার জমা হয়েছে মৃত-প্রাণীর অসংখ্য কঙ্কাল এবং আস্তদেহ। অতএব একই সঙ্গে পলি, কাদা, বালি, কঙ্কাল প্রভৃতি সবকিছুই আভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে পরিণত হয়ে গেছে পাললিক শিলায়। সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকের এক একটি বিশেষস্তর।

পাললিক শিলার এই যে সজ্জাক্রম বা স্তরবিন্যাস কোন কোন জায়গায় ভূমিক্ষয় হলে বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। নানা কারণে অবশ্য ভূমিক্ষয় হয়। ভূতত্ত্ববিদরা এই ভূমিক্ষয়কে ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা সন্ধান লাভ করেছেন পাঁচটি প্রধান স্তরের।

পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, এক একটি স্তর গঠন করতে সুদীর্ঘকালের প্রয়োজন হয়। কত বছরে কী পরিমাণ পলি জমা হতে হতে অনুরূপ স্তর গঠিত হয় তাও ঠিক করে নিয়েছেন। তাই অতি সহজে তারা অঙ্ককষে এক একটি স্তরের বয়স নির্ণয় করে নিয়েছেন। অতএব যে স্তরে যে প্রাণীরদেহ জমা পড়েছে সেই স্তরের বয়স অনুযায়ী জীবটি কত প্রাচীন তা সহজে নির্ণয় করে নেওয়া হয়।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এক একটি স্তরের বয়স কম করে

কয়েক কোটি বছর। ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রাপ্ত স্তর পাঁচটিকে তাই পাঁচটি মহাযুগের নামে চিহ্নিত করে থাকেন তাঁরা। যেহেতু এক একটি স্তর গঠিত হতে কোটি কোটি বছর লেগে গেছে সেই কারণে এক একটি মহা-যুগেরও বয়স কয়েক কোটি বছর। অপরদিকে এক একটি মহাযুগের স্থায়িত্বকাল সুদীর্ঘ হওয়ায় ঐ স্তরবিন্যাস থেকেই মহাযুগকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং প্রত্যেক বিভাগের বয়সও নির্ণয় করে নিয়েছেন।

আরও কয়েকটি পদ্ধতিতে ভূত্বকের তথা ভূত্বকের গায়ে জমা হওয়া জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হল, পৃথিবীর উপরিভাগের নানা স্তরবিন্যাসকে নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করা। ভূতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন, ভূত্বকের একেবারে নিম্নাংশে রয়েছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তরটি। তারই উপরে ক্রমান্বয়ে সজ্জিত হয়ে আছে পরবর্তীকালে গড়ে-ওঠা নতুন নতুন স্তরগুলি। যেন মূল ভিত্তির উপর রচিত হয়েছে ইমারত। তাই স্তরগুলিতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বয়সও ঐ স্তর গঠনের বয়সের সঙ্গে সমান।

আজকাল শিলাস্তরের, বিশেষ করে পাললিক শিলার বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে "ইউরেনিয়াম লেড" নামক পদ্ধতিটির সাহায্যে। বিজ্ঞানীকের মতে এই পদ্ধতিতে কিছুমাত্র খুঁৎ নেই। বা যতটুকু আছে তা উপেক্ষণীয়।

শিক্ষার্থী মাত্রই জানে, ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিকপদার্থ এবং প্রকৃতিতে ওরা তেজস্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজকরে। কিন্তু ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা অস্থায়ী। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে করতে একদিন সাধারণ সীসা নামক ধাতুতে পরিণত হয়ে যায়। তবে ইউরেনিয়াম থেকে সীসায় পরিণত হওয়ার বয়স কিন্তু নিতান্ত কম নয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রত্যেক ৬৬,০০০,০০০ বছরে মোট ইউরেনিয়ামের শতকরা মাত্র একভাগ ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে সীসা উৎপন্ন করে। তাই পাললিক শিলাস্তরে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামের মধ্যে সীসার অনুপাত নির্ণয় করেই বিজ্ঞানীরা সঠিক বয়স বলে দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্নও আসতে পারে। ইউরেনিয়ামের মধ্যে পূর্ব থেকে যে সীসা মিশ্রিত নেই—একথা কেমন করে বলা যায়? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একটি ভাল যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে সাধারণ সীসা এবং ইউরেনিয়ামের শেষ পরিণতিরূপে প্রাপ্ত সীসার মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ আছে। তফাৎটা ওদের পারমাণবিক গুরুত্বের। সাধারণ সীসা অপেক্ষা ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন সীসার পারমাণবিক গুরুত্ব মাত্র এক বেশি।

জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের ব্যাপারে আরও একটি পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রাণীর মৃতদেহের মধ্যে তেজস্ক্রিয় কারবনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। জীব প্রকৃতি থেকে যেমন সাধারণ কারবন (c-১২) গ্রহণ করে থাকে তেমনই কিছুটা তেজস্ক্রিয় কারবন (c-১৪) ও গ্রহণ করে থাকে। প্রাণীর মৃত্যুর পর তার দেহের তেজস্ক্রিয় কারবনরা ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয়তা হারাতে হারাতে একদিন সাধারণ কারবনে রূপান্তরিত হয়। তবে উক্ত প্রক্রিয়া ইউরেনিয়ামের মত এক দীর্ঘ সময় ধরে চলেনা। দেখা গেছে, তেজস্ক্রিয় কারবন অতিদ্রুত তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তাই উক্ত পদ্ধতিটির একটা অসুবিধা হচ্ছে, খুব প্রাচীন জীবদেহে উক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে কোন সুফল পাওয়া যায়না।

জীবাশ্মের ভিত্তিতে পৃথিবীর যুগবিভাগ

পৃথিবীর উপরিভাগে আজ আমরা যে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদের সাক্ষাৎ লাভ করছি, তারা চিরকাল ধরে একইভাবে বিরাজ করে আসছেনা। যুগের পর যুগ ধরে ওদের একের পর এক আবির্ভাব হয়েছে আবার লয়ও হয়ে যেতে হয়েছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে। কারও কারও বংশধারা যে পরবর্তীকালের জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়েছে এমন নয়। তবে অধিংকাংশই হয়ে গেছে লুপ্ত।

এখন জীবের কথাই ধরা যাক। কালে কালে পৃথিবীর বুকে ওরা কত যে এসেছে এবং ধরা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে তার হিসেব

পাওয়া বড় কষ্টকর। অথচ অতীতের সেই সব জীব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেকে আজ আগ্রহী। বিজ্ঞানীরাও বলেছেন, অতীত দিনের জীব সম্বন্ধে আমরা যদি প্রকৃতজ্ঞান লাভ করতে না পারি তাহলে নিজেদের সম্বন্ধেও কিছু জানতে পারবো না। তাঁদের মতে, জীবেরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় একদিন মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে। তাই অতীতের সেই সব ইতর প্রাণীদের সঙ্গেও আমাদের আছে নিবিড় যোগ। এমনকি মানুষের পূর্ব-পুরুষের পর্যায়েও তাদের ফেলতে পারা যায়। প্রথমে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকে এসেছিল এককোষী প্রাণী। সেই এককোষী প্রাণী থেকে কালক্রমে উৎপন্ন হয়েছে বহুকোষী প্রাণী। সর্বশেষ স্তরে আবির্ভাব উন্নত জীব মানুষের। এর জন্য অতিক্রান্ত হয়েছে কয়েকশ' কোটি বছর। এই সুদীর্ঘ সময়কালে কত প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে, ঘুরে বেড়িয়েছে সাগরের অথৈ জলে এবং গহণ অরণ্যানীর মধ্যে। কেউ লুপ্ত হয়ে গেছে, কেউবা কোন প্রকারে আপন বংশধারাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পরিশেষে সেই ঘনান্ধকার পরিবেশ থেকে সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানুষ। কিন্তু তার ধমনীতে প্রবাহিত ওদেরই রক্ত। তাই বোধ হয় মানব মনের অবচেতনে লুকিয়ে আছে অরণ্যের প্রতি আকর্ষণ, পৃথিবীর জীবজগতের প্রতি দুর্বার কৌতূহল।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আজ প্রমাণিত হয়েছে, জলচর জীব থেকে উভচর এবং উভচর জীব থেকে স্থলচর জীবের উদ্ভব। প্রথমে নিরস্থিক প্রাণী, তার পরে মেরুদণ্ডী, অতঃপর মেরুদণ্ডী থেকে কালক্রমে আবির্ভূত হয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। স্তন্যপায়ীর সর্বশেষ স্তরে এসেছে মানুষ।

বিজ্ঞানীদের উক্ত সিদ্ধান্তগুলি নিছক কল্পনা নয়। পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে থাকা জীবাশ্মদের উদ্ধার করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ঐ জীবাশ্মই তাঁদের নির্দেশ করে দিয়েছে অভিব্যক্তির ধারাটি। তাঁরা স্পষ্টই ধরতে পেরেছেন যে কোন যুগের প্রাণীর উৎপত্তি ও বিকাশ লুকিয়ে আছে সেই যুগে গঠিত পাললিক শিলাস্তরের গায়ে। কেউ আছে অবিকৃত, কারও কঙ্কাল, কারও দেহের বিভিন্ন অংশ।

প্রকৃতপক্ষে ভূতত্ত্ববিদদের দ্বারা ভূত্বকের শিলাস্তর বিশ্লেষিত হওয়ার ফলেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর অতীত দিনের ইতিহাসটা। সে ইতিহাস কোটি-কোটি বছরের ইতিহাস, জীবের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। উক্ত ইতিহাস তথা প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার জন্য ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের এই ইতিহাসকে কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক যুগে ভাগ করেছেন এবং এক একটি যুগের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কিভাবে অগ্রগতি হয়েছে তাও জানিয়েছেন।

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসটাকে প্রথমে তাঁরা বিভক্ত করেছেন পাঁচটি মহাযুগে। মহাযুগগুলি যথাক্রমে আর্কিওজোয়িক, প্রোটোরোজোয়িক, প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক ও কেনোজোয়িক। জীবের উদ্ভবের যুগকে নাম দিয়েছেন আর্কিওজোয়িক এবং মানুষের উদ্ভবের কালকে কেনোজোয়িক।

যেহেতু এক একটি মহাযুগের স্থায়িত্বকাল সুদীর্ঘ, তাই মহাযুগকে আবার কতকগুলি পিরিয়ড বা যুগে ভাগ করেছেন। যুগগুলির নামকরণ করেছেন বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশকে অনুসরণ করে অথবা কোন স্থানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন পর্বতের উৎপত্তিকে লক্ষ্য করে। যেমন ক্যাম্‌ব্রিয়ান, অর্ডোভিসিয়ান, সিলুরিয়ান, ডিভোনিয়ান প্রভৃতি যুগগুলির নামকরণ করা হয়েছে ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এর কয়েকটি স্থানের নামানুসারে। ট্রায়াসিক নামক যুগটির নামকরণ করা হয়েছে জার্মানীর ত্রি-বিভক্ত একটি পর্বতের নামে এবং সুইজারল্যাণ্ডের জুরা পর্বতের নামে নামকরণ করা হয়েছে জুরাসিক যুগ।

সুবিধার জন্য কোন কোন যুগকে আবার এপোকে বিভক্ত করা হয়েছে। এপোকের নামকরণ করা হয়েছে বিশেষ অর্থকে পরিবহণ করার জন্য। কোয়াটারনারী যুগের (বর্তমান কেনোজোয়িক মহাযুগের অংশ) এওসিন এপোকের অর্থ নতুনের সূত্রপাত। ওলিগোসিন অর্থে সামান্য কয়েকটি নতুন, মাওসিন অর্থে বেশ কিছু নতুন, প্লিস্টোসিন অর্থে অধিকাংশ নতুন, ইত্যাদি।

মহাযুগগুলির নামও বিশেষ অর্থবহ। যেমন কেনোজোয়িক অর্থে নতুনের আরম্ভ অপর অর্থে স্তন্যপায়ীদের আমল। মেসোজোয়িক মহাযুগকে বলা হয় সরীসৃপের যুগ এবং প্যালিওজোয়িক মহাযুগকে বলা হয় মৎস্যযুগ।

এখন একটা প্রশ্ন, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে কবে? যেদিন পৃথিবী জন্মলাভ করেছিল, সেইদিন কী লাভ করেছিল প্রাণকে?

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আদিতে পৃথিবী যখন সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহের রূপ গ্রহণ করেছিল তখন সে ছিল অতি উত্তপ্ত। জল ছিল না, বর্তমানের মত আবহমণ্ডলও ছিল না। ছিল ভয়ঙ্কর এক অগ্নিস্তূপ। এমন অবস্থায় কোনমতেই পৃথিবীতে প্রাণের কল্পনা করা যায় না।

পৃথিবীর জন্মের পর তার দেহটাকে শীতল করতেও অতিক্রান্ত হয়েছে কোটি কোটি বছর। তখন উপরিভাগটা শীতল হলেও অভ্যন্তর ভাগ ছিল ভয়ানক অস্থির। আবহমণ্ডলেরও পরিবর্তন হচ্ছিল ঘন ঘন। তাই সব সময়ই লেগে থাকতো ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। এখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়গিরি। সমগ্র পৃথিবীটা ছিল গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জলভাগেরও সৃষ্টি হয়নি। অতএব এই অবস্থায়ও কেটে গেছে কত কোটি বছর। সে সময়টাও জীবের আবির্ভাবের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল ছিল। বন্ধ্যা পৃথিবীকে মহাকাশের নিয়ম অনুযায়ী পিতৃদেব সূর্যের চারপাশেই তার অভিশপ্ত রূপটাকে নিয়ে পরিক্রমা করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় পৃথিবীর যে কত সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে না।

তারপর আরও শীতল হলো পৃথিবীর দেহখানা। শীতল হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিতও হতে হলো। আগের মত বিশাল আয়তন আর থাকলো না। পৃথিবীপৃষ্ঠ এখানে সেখানে তুমড়ে গেল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যেখানে কঠিন শিলাস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো উপরের দিকে। সৃষ্টি হলো পাহাড়-পর্বতের।

অবশেষে পৃথিবীর আবহমণ্ডলও শীতল হলো। তারপর এক শুভক্ষণে আবহমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে অঝোর ধারায় ঝরলো বৃষ্টির আকারে। সে বৃষ্টি এক আধদিনে থামলো না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঝরলো অবিরল ধারায়। পূর্বে আভ্যন্তরীণ শিলাস্তর মাথা উঁচু করায় পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল এবার সমগ্র পৃথিবী জলে থৈ থৈ করতে লগেলো। কিন্তু বিপর্যয় চলেছিল সমান তালে। অপর দিকে স্থলভাগ বলতে পাহাড় পর্বতের শীর্ষদেশ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। বহু আগ্নেয় পর্বতও নিমজ্জিত হয়েছিল অতল জলের তলায়।

অতএব পৃথিবীর জন্ম থেকে জলমগ্ন হওয়ার অবস্থা পর্যন্ত কী প্রাণী, কী উদ্ভিদ কেউ আসতে পারেনি। এই সময়টা খুব কম করেও দুশ' কোটি বছরের মত। অর্থাৎ জন্ম থেকে দুশ' কোটি বছর পৃথিবীর ইতিহাসটা জীবহীন ও উদ্ভিদহীন এক উত্তপ্ত পরিবেশ এবং বর্তমানের গবেষণার বিষয়।

পৃথিবীতে বৃষ্টি নামার পর কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সুযোগ পেয়েছিল আরও শীতল হতে। পাহাড়-পর্বতের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিধারার সঙ্গে বাহিত হয়ে জমতে পেরেছিল সমুদ্রের তলদেশে। কালক্রমে উদ্ভব হয়েছিল স্থলভাগের। তবে বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে যে দুর্যোগ বন্ধ হয়েছিল এমন নয়। সেই দুর্যোগের ফলে বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে সমুদ্র ও স্থলভাগের সীমারেখা। কখনও কখনও এক-একটি স্থলভাগ মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগোপন করেছে মহাসমুদ্রের মাঝখানে।

পৃথিবীতে প্রাণী আসার পরেও প্রলয় এসেছে বারে বারে। এমনও হয়েছে, বিপর্যয়ের ফলে সেদিনের জীবকুলকে মাঝে মাঝে আটকে পড়তে হয়েছে পর্বতবেষ্টিত হয়ে। পরিণামে বরণ করেছে মৃত্যুকে। অপরদিকে পৃথিবীর পরিবেশও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। আবহ-মণ্ডলেরও তেমনিই হয়েছে পরিবর্তন। তাই যে পরিবেশে যে-সব জীব পৃথিবীতে এসেছিল পরিবর্তিত পরিবেশ তারা সহ্য করতে পারলো না। অন্যদিকে পরিবেশের গুণে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যেও আসতে আরম্ভ করে

নানা পরিবর্তন। যে সব জীব ও উদ্ভিদ সেই পরিবেশকে মেনে নিতে পেরেছে সেইই কেবল টিকে গেছে। আর যারা পারেনি, তাদের লুপ্ত হয়ে যেতে হয়েছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে।

পৃথিবীর পরিবর্তনের ইতিহাসটা সুদীর্ঘকালের এবং পৃথিবীর জন্মও হয়েছে কয়েকশ কোটি বছর আগে। সঠিক সময়টা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে বিজ্ঞানীরা সময়টা নির্ণয় করার ব্যাপারে একেবারে চুপ করে বসে নেই। তাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে পৃথিবীর বয়স একটা নির্ণয় করেছেন। যদিও ত্রুটি আছে যথেষ্ট তথাপি মহাকালের দরবারে সুবৃহৎ সময়কালের মধ্যে সামান্য ত্রুটিকে অবহেলা করা যেতে পারে।

ভূতাত্ত্বিক ও পদার্থিক উপায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা যে ভাবে বয়স নির্ণয় করেছেন তার প্রধান কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হল।

প্রথমতঃ নানা নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীর উপরিভাগটা ক্রমাগত ক্ষয় হচ্ছে। শিলাস্তর হচ্ছে চূর্ণ-বিচূর্ণ। সেগুলি আবার এক জায়গায় থেকে যাচ্ছে না। বায়ুপ্রবাহ ও নদীপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে জমা হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে। সেগুলি পরপর শিলায় রূপান্তরিত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে নানা স্তরের। ঐ স্তরগুলি দেখেই জীবাশ্মের মত পৃথিবীর বয়সটাও অনুমান করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমে পৃথিবীর বুকে যখন বৃষ্টি নেমেছিল তখন জল আদৌ লোনা ছিল না। পৃথিবীর আদি সমুদ্রের জল ছিলনা লবণাক্ত। বৃষ্টির জল পৃথিবীর উপরিভাগের আগ্নেয়শিলা থেকে লবণকে ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে জমা করছে। তাই ধীরে ধীরে লবণাক্ত হয়ে উঠছে সমুদ্রের জল। আদিতে সমুদ্রে লবণের পরিমাণকে শূন্য ধরে আজকে সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণটা নির্ণয় করে অনুমান করা হয় পৃথিবীর বয়স। বলা বাহুল্য, প্রতিবছর কি পরিমাণ লবণ এসে সমুদ্রের জলে মিশে যাচ্ছে—সেটি নির্ণয় করে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

উক্ত পদ্ধতিতে কিন্তু খানিকটা ত্রুটি থেকে যায়। কারণ, পৃথিবীতে

সমুদ্র সৃষ্টি হওয়ার আগে অনেক সময় ব্যয়িত হয়ে গেছে। সেই সময়টা নির্ণয় করতে গিয়ে একমাত্র অনুমানকেই প্রাধান্য দান করতে হয়।

তৃতীয় আর একটি পদ্ধতিকেও অনেকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতি অনুসারে ধরা হয়, পৃথিবী আদিতে ছিল ভয়ঙ্কর একটি অগ্নিময় গোলক। তাপ হারাতে হারাতে শীতল হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। তাপ হারানোর পরিমাণটা মোটামুটি স্থির করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারই ফলে নির্ণয় করেছেন পৃথিবীর বয়স। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও আছে যথেষ্ট ত্রুটি। বিশেষ করে ঐ তাপ হারানোর ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে। তাই পদ্ধতিটি বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর সমর্থন লাভ করতে পারেনি।

চতুর্থ পদ্ধতিই বিজ্ঞানীদের মতে অনেকটা নিখুঁত পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির নাম ইউরেনিয়াম লেড পদ্ধতি। পদ্ধতিটি যেহেতু জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। তাই পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল ইউরেনিয়াম নয় থোরিয়াম নামক আর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের উপরও উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ, থোরিয়াম ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে করতে সীমায় পরিণত হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রে ধরা হয়, আদিতে এদের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ছিল বেশি।

ইউরেনিয়াম লেড পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের কাছে খুব প্রিয়। এই পদ্ধতিতে তাঁরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বয়স প্রায় চারশ' কোটি বছরের মত। অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পৃথিবীর বয়স কিন্তু যথেষ্ট কম।

পৃথিবীর বয়সের হিসেব পাওয়া গেল। এবার নির্ণয় করার পালা জীবসৃষ্টির লগ্ন। কিন্তু উক্ত ব্যাপারেও সমস্যা কিছু কম নেই। তথাপি বিজ্ঞানীরা একটা হিসাব দাখিল করেছেন এবং কোন্ পরিবেশে ও কেমন করে পৃথিবীতে জীব এসেছিল তারও আভাস দিয়েছেন।

পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব

পৃথিবী তার উত্তপ্ত দেহটাকে শীতল করলো, একদিন লাভও করলো জীববাসের পরিবেশ, কিন্তু কেমন করে আগমন হল আদিকালের প্রথম জীবের? আজ থেকে কতকাল আগেই বা তারা এসেছিল?

উক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করতে চিরকাল মানুষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এসেছে। এখনও যে সমূহ প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছে, তাও নয়। তবে যুক্তি-তর্ক এবং নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কিছুটা সত্যে উপনীত হয়েছে মাত্র।

প্রথমে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিলেন, জড় থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা মনে করতো সাপের উৎপত্তি কাদা থেকে। গ্রীকরা মনে করতো, আবর্জনাস্তূপ থেকে জন্মগ্রহণ করে ইঁদুর। এমন কি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদেরও ধারণা ছিল, জীব আপনা হতেই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন এমন কিছু কিছু জীব আছে, তাদের পূর্বপুরুষ নেই। বিশেষতঃ জীবাণুদের গতিবিধি লক্ষ্য করেই তাঁরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, জীবাণুরাও স্বয়ং সৃষ্ট নয়। সর্বসমক্ষে তিনি কতকগুলি পরীক্ষাও করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করেছিল, জীবাণুরা পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুস্তরে আবার এদের পরিমাণটা বেশি, উপরের দিকে ক্রমশঃ কম। মদ, মাংস, দুধ প্রভৃতির উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন পাস্তুর। দেখেছিলেন, মুক্ত পরিবেশে কোন কিছু থাকলে জীবাণুর উৎপত্তি হয় কিন্তু বায়ুনিরুদ্ধ পরিবেশে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

পাস্তুরের পরীক্ষা থেকে সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল, কেবলমাত্র জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়, জড় থেকে জীবের উৎপত্তি হয় না। অপরদিকে অন্য কোন গ্রহ থেকে যে জীব এসেছে, তার মূলেও জোরালো কোন যুক্তি নেই। তাহলে প্রথম জীব পৃথিবীতে এসেছিল কেমন করে?

বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে কিন্তু জড় পদার্থের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে একথাও স্বীকার করেছেন যে, জড় থেকে জীব সৃষ্টি হতে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ট্যানলী মিলার বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণের ভেতরে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে সর্বপ্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষণ

করতে সমর্থ হন। অথচ এই অ্যামাইনো অ্যাসিড অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি জৈব যৌগ ছাড়া অন্য কিছু নয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই উৎপন্ন হয় প্রোটিন, যা প্রোটোপ্লাজমের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বর্তমানকালে বিজ্ঞানীরা আবার ভাইরাস নামে অতি ক্ষুদ্র এক জৈব কণিকার সন্ধান লাভ করেছেন। ভাইরাসরা একটি মাত্র আর. এন. এ. অণু দিয়ে গঠিত। ওরা জীব ও জড় উভয় অবস্থায় থাকতে পারে। কখনও কখনও কেলাসে রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল থেকেও যায়। পরে উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করলে পুনরায় সজীব হয়ে উঠে এবং বংশবিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই ভাইরাসরা বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় রকমের বিস্ময়। আর ঐ ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার পরই বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, আদিতে জড় থেকেই পৃথিবীতে এসেছে প্রথম জীব এবং সেই জীব ছিল ভাইরাস জাতীয়।

বর্তমানে প্রাণীর কোষ মধ্যস্থিত ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. নামক দুটি জটিল যৌগ সম্বন্ধে উন্নত গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা উক্ত জৈব যৌগগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে অজৈব পদার্থ থেকে ওদের প্রস্তুত করতেও সমর্থ হয়েছেন। তাই মনে করেছেন, আদিম জীবনের উৎপত্তি রহস্য অজৈব পদার্থগুলির মধ্যেই নিহিত আছে।

ভূতত্ত্ববিদেরা এবং রসায়নবিদেবা ধারণা পোষণ করেছেন, পৃথিবী তার অতিতপ্ত দেহটাকে শীতল করতে জন্ম থেকে প্রায় দুশ' কোটি বছর অতিক্রম করেছিল। তার পরে পৃথিবীর বুকে রচিত হয় জৈব যৌগ সৃষ্টির পরিবেশ। সে সময় পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য। অক্সিজেন একেবারে ছিল না বললেও চলে। সে সময় পৃথিবী উত্তপ্তও বড় কম ছিল না। অন্যদিকে সেই উত্তপ্ত অবস্থায় সবটুকু অক্সিজেন পৃথিবীর উপরিভাগের লোহা, সিলিকন প্রভৃতির সঙ্গে ক্রিয়া করে যৌগিক অবস্থায় অবস্থান করছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ যেহেতু ছিল অস্থির

এবং এখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়গিরি, তাই অগ্ন্যুৎপাত সব সময় লেগেই থাকতো। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে লাভা নির্গত হতো তাতেও থাকতো প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প, মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস। ঐ আগ্নেয়গিরিগুলির দ্বারা অবিশ্রান্তভাবে লাভা উদগীরণ হতো। তাই পৃথিবীর আকাশটাও ছিল গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সেই অতিতপ্ত পরিবেশে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি অজৈব পদার্থগুলি কয়েকটি জৈব যৌগ গঠন করেছিল। আজ অবশ্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কারণ, একদিন জৈব যৌগগুলিকে প্রকৃতির দান হিসাবে বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে বহু জটিল জৈব যৌগকে রসায়নবিদরা সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি জীবকোষের মধ্যস্থিত কোন কোন জটিল যৌগকেও। উক্ত কারণে জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য পূর্বের তুলনায় অনেকটা সঙ্কুচিত। বিজ্ঞানীরা এমনও ধারণা পোষণ করছেন, অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে একটি জীবকোষকেও উপহার দিতে পারবেন।

তাই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আজ থেকে প্রায় তিনশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর পরিবেশ ছিল অতি ভয়ঙ্কর। সে সময় আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎক্ষরণ, আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি ও গামারশ্মির বিকিরণের প্রভাবে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও জলায়বাষ্প থেকেই প্রথম সরল জৈবযৌগ সংশ্লেষিত হয়েছিল। আরও পরে সেই সরল যৌগগুলি তৎকালীন পরিবেশে উৎপন্ন করেছিল নানা জটিল জৈব যৌগ। সরল থেকে জটিলে রূপান্তরিত হতে হতে ও পৃথিবীর অতিক্রান্ত হয়েছিল বহু কোটি বছর।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন অধ্যাপক স্ট্যানলী মিলারের মত মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি উপরোক্ত চারটি গ্যাসীয় পদার্থকে গামা রশ্মির সাহায্যে সংশ্লেষণ ঘটিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ছ'টি কারবন পরমাণুযুক্ত সুগার এবং পিউরিন ও পিরিমিডিন নামে নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপাদক দুটি প্রোটিন অণু উৎপাদন করতে সমর্থ হওয়ায় উপরোক্ত

মতকে অর্থাৎ জড় থেকে পৃথিবীতে যে জীবের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে।

পরের দিকে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শৈত্য প্রয়োগের মাধ্যমে পলিপেপটাইট শৃঙ্খল ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ করাও সম্ভব হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, জৈব যৌগগুলির সমূহ অণু সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলেই উৎপন্ন হয়েছিল। পরে বৃষ্টিধারার সঙ্গে সেগুলি নেমে আসে পৃথিবীর বুকে এবং সঞ্চিত হতে থাকে হ্রদ ও সমুদ্রের জলে। কালক্রমে ঐ যৌগগুলি থেকে প্রথমে জলেই সৃষ্টি হয় জীবকোষ। কিন্তু কিভাবে যে যৌগগুলি একত্রিত হয়েছিল এবং কিভাবে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবকোষ গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল তা আজও অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে থেকে গেছে।

বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন, উৎপন্ন জীবকোষের প্রধান কাজ হলো শক্তি উৎপাদন করা। আদিতে জীবকোষগুলি পরিবেশ থেকে জৈব যৌগসমূহ সংগ্রহ করতো এবং তা থেকে শক্তি উৎপাদন করতো। অনেকের বিশ্বাস, জীবসৃষ্টির আদিতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিলনা। তাই মনে করা হয়, সে সময় উৎপন্ন জীবকোষগুলি অবাত-শ্বসন পদ্ধতিতে শ্বাসকার্য পরিচালনা করতো।

প্রথম সৃষ্ট জীবকোষ স্বভোজী কিংবা পরভোজী ছিল, সে সম্বন্ধেও সঠিকভাবে কোনকিছু বলার উপায় নেই। স্বভোজী হতে হলে জীবদেহে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, সে সব বৈশিষ্ট্য আদি জীবকোষের ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতে পরিবেশের জৈব যৌগ সংগ্রহ করে তাদের পুষ্ট হতে হতো। অর্থাৎ আদিম জীবকোষ পরভোজীই ছিল। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি, প্রথম সৃষ্ট জীবকোষ পরভোজীয় পুষ্টির মাধ্যমে জীবন-যাত্রা শুরু করেছিল পৃথিবীতে। তবে কেমন করে যে তারা খাদ্য সংগ্রহ করতো, সে তথ্য আজও অনাবিষ্কৃত।

জীবকোষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আদিতে যে সব জীবের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হতো। তবে সে বিভাজন পদ্ধতি ছিল নিতান্ত সরল। তথাপি অনেকের বিশ্বাস, জীবকোষ তার

প্রোটিনের প্রতিলিপি গঠন করতে সক্ষম হতো এবং এটি সম্পন্ন হতো সম্পূর্ণ অযৌন উপায়ে। অনেক পরে সমুদ্রের জলে লালিত জীবকোষ প্রকৃতির পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনই তাদের দেহের মধ্যে দেখা দেয় নানা বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি যৌন জননের মাধ্যমে সন্তান সন্ততির মধ্যে সঞ্চালিত হতে আরম্ভ করে।

স্বভোজী জীবের উদ্ভব

আদিম পরভোজী জীবকোষ সেদিন পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়ে উঠতো। কোটি কোটি বছর ধরে তারা সাগর জলে বংশ বিস্তার করতে থাকে। শেষে তাদের সংখ্যা এতখানি বেড়ে যায় যে, তাদের পরিবেশের মধ্যে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। তখন একরকম বাধ্য হয়েই অনেককে খাদ্যগ্রহণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো। উপায় না পেয়েই সেদিন তারা অজৈব পদার্থগুলি থেকে আয়ত্ত করেছিল জৈবপদার্থ সংশ্লেষ করার কৌশল। তবে এ কৌশলটি তারা দু-চার পুরুষের মধ্যে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। প্রয়োজন হয়েছিল লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর। অপরদিকে সব প্রাণী স্বভোজী হওয়ার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। পরভোজী অবস্থায়ও ছিল বহু সংখ্যক প্রাণী।

যারা স্বভোজী হয়ে উঠেছিল তাদের দৈহিক গঠনও ধীরে ধীরে পরিবর্তিতে হয়ে উঠেছিল। তবে উক্ত সময় পর্যন্তও জীবদেহের আকার ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র। অনেকটা আজকের দিনের স্বভোজী ব্যাকটিরিয়াদের মত আকাব। আর ঐ ব্যাকটিরিয়াদের মতই তারা রাসায়নিক সংশ্লেষে অভ্যস্ত হয়ে স্বভোজী হয়ে উঠেছিল।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বহু জাতের ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান লাভ করেছেন। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করেছেন ওদের জীবনযাত্রা প্রণালী। একজাতীয় সবুজ ও বেগুনী রঙের ব্যাকটিরিয়ার কথা জেনেছেন তাঁরা। ঐ জাতীয় ব্যাকটিরিয়াদের বলা হয় সালফার ব্যাকটিরিয়া। ওরা হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে এবং ঐ

হাইড্রোজেনের দ্বারা কারবন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে জল-অঙ্গার ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এইসব বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকেই বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, আদিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষও ঐ ব্যাকটিরিয়াদের মতই স্বভোজী হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করে থাকেন, আদিম স্বভোজী জীবকোষ থেকেই কালক্রমে উৎপন্ন হয়েছিল উদ্ভিদ।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সমূহ জীবকোষ স্বভোজী হয়ে উঠতে পারেনি। পরভোজীর সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। এবং তারাও বংশবিস্তার করতো। এককথায় পরভোজী থেকে স্বভোজীর উদ্ভব হলেও স্বভোজী এবং পরভোজী উভয় শ্রেণীর জীবই পাশাপাশি বিরাজ করতো। যদিও এই অবস্থান্তরের ফলে অনেককে বিদায় নিতে হয়েছে তথাপি এর ফলটাও হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্বভোজী ও পরভোজী উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো। স্বভোজীরা খাদ্যপ্রস্তুতির সময় যে অক্সিজেন উৎপন্ন করলো তা পরভোজীরা সবাত শ্বসনের জন্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো এবং তারই ফলে পরভোজীরা উৎপন্ন করলো কারবন ডাই-অক্সাইড। অন্যদিকে আবার কারবন ডাই-অক্সাইড সালোক সংশ্লেষের কাজে ব্যবহৃত হয় তাই স্বভোজীরা পুনরায় একে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। প্রকৃতপক্ষে সেই আদিকালে পরস্পর বিপরীত অথচ একে অপরের উপর নির্ভরশীল দুই জীবের মধ্যে স্বভোজী থেকে উৎপন্ন হয়েছিল উদ্ভিদ জগৎ এবং পরভোজী থেকে উৎপন্ন হয়েছিল জীবজগৎ।

সৃষ্টি লগ্ন থেকে কোটি কোটি বছরের মধ্যেও ওদের দৈহিক গঠন তেমন সুগঠিত হতে পারেনি। তখন ওরা ছিল নিতান্ত নিম্নস্তরের। পরে আরও অতিবাহিত হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ বছর। পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যেও আসে নানা পরিবর্তন। পরিবর্তিত হতে থাকে পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলও। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় জীব ও উদ্ভিদকোষগুলি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এবং পরিবেশের গুণেই উভয়কোষ হয় সুগঠিত। আদিতে উদ্ভূত সেই নিম্নশ্রেণীর জীবকোষের নাম রেখেছেন বিজ্ঞানীরা প্রোক্যারিওট এবং পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন সুগঠিত জীবকোষের নাম রেখেছেন ইউক্যারিওট।

বর্তমানকালেও সেই আদিম জীবকোষ তথা প্রোক্যারিওট ও ইউ-ক্যারিওটদের দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানের ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবাল প্রোক্যারিওট বা আদি জীবকোষ। বাদবাকি সমস্ত উদ্ভিদকোষ এবং জীবকোষই ইউক্যারিওট এর অন্তর্ভুক্ত। প্রোক্যারিওট কোষে কোষআবরণী, নিউক্লিও পর্দা, নিউক্লিয়াস, গল্পি, মাইটোকনড্রিয়া, সেন্ট্রোসোম, প্লাস্টিড, লাইসোম প্রভৃতি কিছুই থাকেনা। কিন্তু প্রকৃতজীবকোষ বা ইউক্যারিওটের মধ্যে উপরোক্ত বস্তুগুলির সব কটিই বিদ্যমান।

বিজ্ঞানীরা এমন ধারণাও পোষণ করে থাকেন, আদিম পৃথিবীর আদিম পরিবেশে সেই সব আদিম স্বাধীনজীবী এককোষী প্রাণীরা দলবদ্ধ-ভাবে উপনিবেশ বা কলোনি গঠন করেছিল। অপরদিকে আদি পর-ভোজী প্রাণীরাও গঠন করেছিল উপনিবেশ। এরা সবাই ছিল এক-কোষী। পরে ঐ এককোষী প্রাণী থেকে পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশে উদ্ভব হয় স্পঞ্জজাতীয় বহুকোষী প্রাণীর। তারপর আরও লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যেও আসতে থাকে দ্রুত পরিবর্তন। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই বিবর্তিত হতে হতে একসময় নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টির লীলায় মেতে উঠে।

জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কে এসেছিল আগে ?

এখন প্রশ্ন আসে পৃথিবীতে কে আগে এসেছিল, জীব না উদ্ভিদ ?

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমে পরভোজী কোষ এবং পরে পরভোজী থেকে স্বভোজী কোষের উদ্ভব। উক্ত দু'ধরনের কোষের কোনটিকে উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ, এরা সবাই প্রকৃত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের মত কোষ বিভাজনে অক্ষম ছিল। একেবারে সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম কোষ। না প্রাণী, না উদ্ভিদ। জীব ও উদ্ভিদের সামান্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল না এদের কারও মধ্যে।

স্বভোজী কোষগুলি থেকে যে উদ্ভিদের উদ্ভব—এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, আদিতে স্বভোজীরা যে ভাবে প্রাধান্য

বিস্তার করেছিল তেমনটি সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের জন্য পরভোজীরা পারেনি। অর্থাৎ পরভোজীরা প্রাণীদেহের রূপলাভ করার ঢের আগেই স্বভোজীরা বিস্ময়করভাবে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরভোজীরা তা পারেনি। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরভোজীদের নির্ভরশীল হতে হয়েছিল অন্যের উপর। তাই লড়াই করতে হয়েছিল নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। এই অবস্থায় তাদের উন্নতি একেবারেই ছিল না। কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল মাত্র। তাদের মধ্যে প্রথমে জাগেনি জীবনোচ্ছ্বাস। প্রকৃত জীবন বলতে যা বুঝায় সেটি পৃথিবীতে প্রথম বহন করে এনেছিল স্বভোজী উদ্ভিদেরাই।

উক্ত মতকে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি এবং দার্শনিকেরাও সমর্থন করেছেন। প্রায় প্রতিটি দেশে প্রাচীনকালে রচিত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ভিদই প্রথম আবির্ভূত হয়েছে পৃথিবীতে। প্রথমে ভারতীয় সুমহান ধর্মশাস্ত্র উপনিষদের কথা ধরা যেতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীতে প্রথমে জন্মলাভ করে ওষধি। ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে জীব। এখানে ওষধি অর্থে যে সব উদ্ভিদ দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকে না, ফল প্রসব করেই মারা যায়। অন্ন অর্থে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

উপনিষদের উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, আগে স্বভোজীরা বংশবিস্তার করেছিল। তারপরে স্বভোজীদের উপর নির্ভরশীল পরভোজী তথা প্রাণীদের বংশবিস্তার। উদ্ভিদ না হলে জীবের প্রাণধারণ আদৌ সম্ভব নয় এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে উপনিষদ এই মহান সত্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

বাইবেলের উক্তিটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে আছে, আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল এবং একই সঙ্গে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন ছিল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার বুকে কোন কিছুই ছিল না। অন্ধকার বারিধিবক্ষে কেবল ঈশ্বরের আত্মাই বিরাজ করছিল (ভারতীয় মহাপুরাণগুলিতে বর্ণিত মহাপ্রলয়ের কাহিনীর সঙ্গে অনেকখানি মিল)।

পরিশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই ঘোর তমসাবৃত পৃথিবীর বুকে একদিন ফুটে উঠলো আলোকের দ্যুতি। পরদিনই তিনি নিজে সৃষ্টি করলেন জ্যোতিঃপুঞ্জ। তৃতীয় দিনে তাঁরই ইচ্ছায় পৃথিবীতে এলো ওষধি, চতুর্থদিনে ঘাস-লতা-গুল্ম প্রভৃতি, পঞ্চমদিনে ফলবান বৃক্ষ এবং ষষ্ঠদিনে পৃথিবীতে এলো মানুষ। অবশ্য বাইবেলের মতে ঈশ্বরের একদিন মানুষের কয়েক সহস্র বছরের সমান।

বিজ্ঞানীরা প্রচলিত কাহিনী কিংবা দার্শনিক মতবাদকে আদৌ প্রাধান্য দান করেন না। যেখানে বাস্তব পরীক্ষা সম্ভব নয় সেখানে অবতারণা করেন যুক্তি ও তর্কের। এক্ষেত্রে তাঁরা বিবর্তনবাদে আস্থাশীল। অনেক চিন্তা করে তাঁরা স্থির করেছেন, অতি ক্ষুদ্র স্বভোজী জীবকোষ থেকে কালক্রমে জলজ শৈবালেরই উৎপত্তি হয়েছিল। একদিকে তারা যেমন স্বভোজী হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে তাদের দেহে ক্লোরোফিল নামক বস্তুটি ছিল। তাই তাদের মধ্যেই এসেছিল প্রাণপ্রাচুর্য। বিবর্তনের ধারায় অতি ক্ষুদ্র এককোষী থেকে বহুকোষীতে পরিণত হয়েছিল প্রথমে তারাই।

পরভোজীদের তথা প্রাণীকোষের অসুবিধা ছিল অনেকখানি। একদিকে অপরের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো, অপরদিকে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেন ছিল না। শ্বাসকার্য চালানোর পক্ষে সে পরিবেশ জীবের বিবর্তনের পক্ষে একেবারেই প্রতিকূল ছিল। উদ্ভিদের বংশবিস্তারের ফলে অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশে ধীরে ধীরে আসতে থাকে অক্সিজেন। তাই বহুপরে শ্বাসকার্য চালানোর সুবিধা হওয়ায় এবং পরিবেশ থেকে যথেষ্ট খাদ্য লাভ করায় প্রাণীদের মধ্যে সূচিত হয়েছিল উন্নতি।

কোন কোন বিজ্ঞানী আবার মনে করে থাকেন, উদ্ভিদ দেহ থেকেই কালক্রমে জীবদেহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উক্ত মত সমর্থনযোগ্য নয়।

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জীবসৃষ্টি এবং তার পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের বিরাট অংশ পৃথিবীতে মানুষ আসার ঢের আগেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। কথিত আছে, প্রায় দু-শ' কোটি বছর ধরে প্রাণীদেহের

বিবর্তনের ফলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে মানুষ। অতএব সেই কোন সুদূর অতীতে প্রাণীদের মধ্যে কিভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা মানুষ জানবে কেমন করে? বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে যে বড় হাতিয়ার জীবাশ্ম বা ফসিল তাও এক্ষেত্রে একেবারে অচল। জীবসৃষ্টি থেকে প্রায় দেড়শ' কোটি বছরের মধ্যে কোন জীবাশ্মই বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়নি বলা চলে। তাঁরা যে সব জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন, তাদের বেশির ভাগের বয়স মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যেই। অতীত পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি বছর যে কেমন করে কেটেছে তার সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা যথেষ্ট কঠিন। কেবল কতকগুলি বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি ও সম্ভাব্যতার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। তাঁদের সেই সমস্ত যুক্তি যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত তাও বলা যায় না। এখনও থেকে গেছে বহু সমস্যা, বহু প্রশ্ন। ভবিষ্যতে হয়ত আরও কত প্রশ্ন আসবে মানুষের মনে। আবার অবতারণা করা হবে কত যুক্তি এবং তর্কের। অনাগত ভবিষ্যতের আরও উন্নত বিজ্ঞানের কাছে আজকের যুক্তিগুলির সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিতও হতে পারে। তথাপি বিজ্ঞানীদের শত শত বছরের গবেষণার ফলকে স্মরণ করতে বাধ্য হবে সেদিনের মানুষ। কারণ বিজ্ঞানই উল্লেখ করেছে, পুরাতনকে ভিত্তি না করলে নতুনের অগ্রগতি হয় না। তাই আজকের বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত মতামতকে চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

প্রাচীন মহাযুগ এবং তার বিভাগ

বিজ্ঞানীরা জীব ও উদ্ভিদের বিবর্তনের ধারাকে স্পষ্ট করার জন্য পৃথিবীর সময়কালকে কতকগুলি মহাযুগে বিভক্ত করেছেন। মহাযুগগুলিকে ভাগ করেছেন কয়েকটি বিভাগ বা যুগে। কোন্ কোন্ যুগে কী ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদ এসেছিল এবং কেমন করে বিবর্তনের ধারায় মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তারই ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

আর্কিও জোয়িক মহাযুগ --

জীবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়কে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন আর্কিও জোয়িক মহাযুগ। পৃথিবীর জন্ম লগ্ন থেকে প্রায় আড়াই শ' কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরম্ভ হয়েছে এই মহাযুগটি। একেবারে আদিপর্ব বলা যেতে পারে এবং এই যুগটির স্থায়িত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর। উক্ত সময়ে কেবল এককোষী পরভোজী ও স্বভোজী জীবকোষের উদ্ভব হয়েছিল। শেষের দিকে সামুদ্রিক শৈবালরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

উক্ত মহাযুগের কোন জীবশ্মই হস্তগত হয়নি বিজ্ঞানীদের। যতটুকু উল্লেখ করেছেন সবই অনুমান ভিত্তিক এবং এই মহাযুগটি সম্বন্ধে ধারণা এমন অস্পষ্ট যে ওর কোন বিভাগ নির্দেশ করেননি বিজ্ঞানীরা। একরকম ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতিদের প্রাধান্য ছিল এই যুগে। পৃথিবীটাও ছিল তখন অশান্ত। ঝড়-বৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি লেগেই থাকতো। অক্সিজেনের পরিমাণও নিতান্ত কম ছিল। অতএব এই অবস্থায় জীবকোষের ক্রমবিবর্তন একেবারেই সম্ভব হয়নি বলা চলে।

প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগ—

আর্কিও জোয়িক মহাযুগের পরে আরম্ভ হয় প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগ। উক্ত মহাযুগটির স্থায়িত্বকাল সর্বাধিক-প্রায় ৯০ কোটি বছর। বিজ্ঞানীদের মতে প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগই বিবর্তনের ধারাটির সূত্রপাত হয়। শেষের দিকে প্রাণীদেহের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। তবে এ যুগেরও কোন জীবাশ্ম তাঁরা লাভ করতে সমর্থ হননি। যে দু-একটি লাভ করেছেন তাও তত স্পষ্ট নয়। কোথাও কোথাও শিলার গায়ে সামুদ্রিক শৈবালের চিহ্ন দেখেছেন। তাই উক্ত মহাযুগকে শৈবালের যুগ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু সে শৈবাল যে কতখানি বড় ছিল তা ভালভাবে জানা যায় না।

প্রাণীদেরও অগ্রগতি হয়েছিল এই মহাযুগে। সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করেছিল এককোষী প্রাণী অ্যামিবা। থলথলে শরীর, স্ত্রী-পুরুষের

কোন ভেদ ছিলনা, দেহ খণ্ডিত হয়ে অপর অ্যামিবার জন্মদান করতো।

প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর বিবরের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। অন্যান্য আরও কয়েকটি তথ্য থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, এই মহাযুগের শেষের দিকে স্পঞ্জ বা ছিদ্রালী প্রাণী, এক নালীদেহী প্রাণী এবং অঙ্গুরীমাল প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল।

প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগেও পৃথিবীর পরিবেশ ততটা শান্ত ছিলনা। স্থলভাগেরও হয়ত উৎপত্তি হয়নি। আর ছিলনা কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী। বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় অমেরুদণ্ডীর কাল এটি।

আর্কিও জোয়িক এবং প্রোটোরো জোয়িক এই দুই মহাযুগকে অনেকে প্রিক্যামব্রিয়ান যুগ হিসাবেও চিহ্নিত করে থাকেন। প্রোটোরো জোয়িক মহাযুগেরও কোন বিভাগ করা হয়নি।

প্যালিও জোয়িক মহাযুগ—

প্যালিও জোয়িক মহাযুগের ব্যাপ্তিকাল বিজ্ঞানীরা প্রায় ২৬ কোটি বছর ধরেছেন। এই যুগের বহু জীবাশ্মেরও সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। তাই উক্ত যুগটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার।

প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিকে প্যালিও জোয়িক মহাযুগকে ৬টি যুগে ভাগ করা হয়েছে। যুগবিভাগগুলি যথাক্রমে ক্যাম্ব্রিয়ান, অর্ডোভিসিয়ান, ডিভোনিয়ান, কারবনিফেরাস ও পারমিয়ান। কারবনিফেরাস যুগকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগ দুটি হল পেনসিল ভেনিয়ান ও মিসিসিপিয়ান। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে উক্ত মহাযুগে গঠিত শিলার স্তর বিন্যাস দেখে স্থানের নামানুসারেই বেশির ভাগ বিভাগগুলির নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। অন্যান্য স্থানের নামানুসারেও নামকরণ করা হয়েছে। যুগগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্যাম্ব্রিয়ান --

প্যালিও জোয়িক মহাযুগের প্রথম ভাগকে বলা হয় ক্যাম্ব্রিক যুগ। এই যুগে গঠিত মৃত্তিকার স্তর পৃথিবীর বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। আর

যেখানেই এই যুগের স্তরকে দেখা গেছে সেইখানেই পাওয়া গেছে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীর জীবাশ্ম। অথচ সে সব প্রাণীর চিহ্নমাত্রও বর্তমানে নেই। আরও আশ্চর্য, ক্যাম্ব্রিক যুগের প্রায় সমূহ জীবাশ্মই আবিষ্কৃত হয়েছে পাহাড়ের চূড়ায় এবং তাদের কোনটিই উভচর কিংবা স্থলচর ছিলনা।

পাহাড়ের শীর্ষে প্রাপ্ত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জীবাশ্ম আমাদের একটি মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছে। ধরে নিতে কোন অসুবিধা হয় না যে, সে সময়ে পৃথিবীটা ছিল জলমগ্ন। স্থলভাগ ছিলনা বললেই চলে। বা যেটুকু স্থলভাগ ছিল, সে কেবল দু-একটি পাহাড়ের চূড়া অথবা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। অধিকাংশ পর্বত ও আগ্নেয়গিরি জলে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল।

আরও ধারণা করা যেতে পারে, সেদিনের পাহাড় পর্বত আজকের মত এত উচ্চ ছিলনা। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগও ছিল অত্যন্ত অস্থির এবং ভূত্বকটার গভীরতাও এখনকার মত ছিলনা। তবে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে কঠিন শিলাস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল। অগ্ন্যুপাতের ফলে এবং পৃথিবী সঙ্কুচিত হওয়ায় কঠিন শিলাস্তর ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী হতে হতে আজকের সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। তা না হলে হিমালয়ের মত উঁচু পর্বতের মাথায় জলজ জীবের প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া যায় কেন?

ক্যাম্ব্রিয়ান যুগটি পৃথিবীর এমন একটি সময়, যে সময়ে পৃথিবীতে ডাঙার হয়ত চিহ্নমাত্রও ছিলনা। ছিলনা গাছপালা, ছিলনা পোকা-মাকড়। আকাশে পাখীরাও উড়ে বেড়াতো না। অপরদিকে সমুদ্রে মেরুদণ্ডী প্রাণীরও আবির্ভাব হয়নি। উদ্ভিদের মধ্যে সেই সমুদ্র গর্ভেই নিমজ্জিত ছিল মস ও লাইকেন জাতীয় শৈবাল।

সেদিনের সেই মহাসমুদ্রে যে সব জীবের আবির্ভাব হয়েছিল, তাদের আকৃতিও ছিল নিতান্ত ছোট। এদের মধ্যে অনেকটা চিংড়ি মাছের মত এবং তিনভাগে বিভক্ত দেহ ট্রাইলোবাইটরাই ছিল প্রধান। তারপর ছিল কাঁকড়ার মত কতকগুলি প্রাণী। তবে পণ্ডিতদের বিশ্বাস, আজকের কাঁকড়ার সঙ্গে সেদিনের কাঁকড়ার অনেকটা আকারগত মিল ছিল।

যুগের পর যুগ ধরে কত প্রাণী এসেছে পৃথিবীর বুকে। একরকম সবাইকে নিশ্চিহ্ন হতে হয়েছে। কিন্তু টিকে আছে ঐ কাঁকড়ারাই। ওদের বহু প্রস্তরীভূত দেহ বিজ্ঞানীরা এখানে সেখানে আবিষ্কার করেছেন। নামকরণ করেছেন ফিলোপোডা, কাকিওপোডা, অথোপোডা প্রভৃতি। তবে ক্যাম্ব্রিক যুগে যাদেরই উদ্ভব হয়েছিল তাদেরই দেহে ছিল শক্ত খোলস। শামুক, প্রবাল প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় ১০ লক্ষ বছর ধরে ক্যাম্ব্রিক যুগের স্থিতিকাল।

প্যালিও জোয়িক মহাযুগের দ্বিতীয় পর্যায় অর্ডোভিসিয়ান যুগ নানা-দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। বিজ্ঞানীরা কয়েক কোটি বছর কালকে এই যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। সমুদ্রে এসেছিল সিপিয়া, অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণী।

অর্ডোভিসিয়ান যুগকে মাছের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। পূর্বে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে অবশ্য কিছু কিছু মাছের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু তাদের আকার ঠিক মাছের মত ছিলনা। অর্ডো-ভিসিয়ান যুগেই মাছরা তাদের প্রকৃত আকার গ্রহণ করে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের বংশ বিস্তার হয়। পরের দিকে তাদের এমন সুসময় আসে যে, অক্টোপাস প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীকে তারা বিতাড়িত করে এবং এক একটি এলাকায় দলবদ্ধভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। অপরদিকে সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীরাও যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস শুরু করে। শক্ত খোলসযুক্ত প্রাণীরও বংশবিস্তার অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে প্রবালরা সংখ্যায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে যে ট্রাইলোবাইটের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্ডোভিসিয়ান যুগে ডাঙার উৎপত্তি হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, ডাঙায়ও কিছু কিছু জীব এসেছিল। বিশেষ করে কয়েক রকমের পতঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু ডাঙায় বৃক্ষশ্রেণী তখনও আসেনি। সমুদ্রে যেমন শৈবালের প্রাধান্য ছিল,

ডাঙায়ও ছিল তাদেরই প্রাধান্য। অতি নিম্নশ্রেণীর স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব হলেও হতে পারে। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ, উক্ত সময়কালের যে সব জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের প্রায় সবই জলচর প্রাণীর।

পরবর্তী সিলুরিয়ান ও ডিভোনিয়ান যুগ দুটিকে একত্রে মিডল প্যালিওজোয়িক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। উক্ত যুগদুটিতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল পৃথিবীর বুকে। উদ্ভিদের বংশবিস্তারের ফলে এবং অন্যান্য কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন স্থান পেতে থাকে। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী সব রকমের জলচর প্রাণীরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালানোর উপযুক্ত দৈহিক গঠন লাভ করতে সমর্থ হয়। ফলে পূর্ববর্তী মাছের দৈহিক গঠনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদ্ভব হয় ফুলকার এবং ফুসফুস সহ অন্যান্য অতিরিক্ত অঙ্গও সংযোজিত হয়।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সিলুরিয়ান যুগেই প্রথম উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আর ডাঙায় এসেছিল কাঁকড়া বিছাদের মত ছোট ছোট প্রাণীরা। সিলুরিয়ান যুগের শেষের দিকে উভচর প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সেই বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে পরবর্তী ডিভোনিয়ান যুগের শেষ পর্যন্ত।

ডিভোনিয়ান যুগেই কিছু কিছু উভচর প্রাণী জলের আবাস পরিত্যাগ করে ধাওয়া করেছিল ডাঙার দিকে। ডাঙায় যে সমস্ত জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছিল তাতেও তারা বিচরণ করতো এবং স্থলে বিচরণ করতেও তাদের অসুবিধা হতোনা। কালক্রমে সেইসব উভচরেরা স্থলকেই ভালবেসে ফেললো। জলে যাওয়ার নামও করলোনা। ফলে লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে জলে বাস করার দৈহিক গঠন তাদের একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। অপরদিকে ধীরে ধীরে লাভ করলো স্থলে বসবাস করার দৈহিক গঠন। তখন স্থায়িভাবেই বসবাস সুরু করে দিল ডাঙায়। এক-কথায় প্যালিও জোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে তথা ডিভোনিয়ান যুগেই ডাঙায় আবির্ভাব হয়েছিল স্থলচর প্রাণীর। আরও বলা যেতে পারে

যে, পৃথিবী জন্মের পর প্রায় চারশ' কোটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর স্থলভাগে এসেছে জীব। যদিও সে জীব আদৌ উচ্চস্তরের ছিলনা এবং বিশাল স্থলভাগে ওদের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। সমুদ্রেই এসেছিল প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক জীব তথা মাছ।

ডিভোনিয়ান যুগের আরম্ভে যে উভচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল, এই তথ্য বিজ্ঞানীরা হস্তগত করেছেন। তাঁরা লাভ করেছেন আদিম উভচর প্রাণীর প্রস্তরে রক্ষিত পায়ের ছাপ ও কঙ্কাল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীণল্যাণ্ডে কতকগুলি উভচর প্রাণীর যে সব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে সেইগুলিকে বিজ্ঞানীরা স্থান দিয়েছেন ডিভোনিয়ান যুগে। এরা আজকের উভচর প্রাণীর মত ছিলনা। দৈর্ঘ্যেও ততটা বড় নয়! উক্ত যুগের স্থলচর প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া যায়নি বলেই ডিভোনিয়ান যুগের সূত্রপাতকে উভচর প্রাণীর আবির্ভাবের কাল ধরা হয়েছে।

উভচর ও স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব হওয়া সত্বেও বিজ্ঞানীরা সবদিক থেকে চিন্তা করে উক্ত যুগটিতে মাছেরই প্রাধান্য ছিল স্বীকার করেছেন। এমনকি সমস্ত প্যালিও জোয়িক মহাযুগকেও মৎস্যযুগ নামে চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন, সিলুরিয়ান যুগের শেষে এবং ডিভোনিয়ান যুগের প্রারম্ভে পরিবেশের শুষ্কতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তারই ফলে মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং বায়ু থেকে অক্সিজেন সংগ্রহের শ্বাসকার্য চালাতে সুরু করে। কালক্রমে কারও কারও দেহে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের উদ্ভব হয়। তারই প্রত্যক্ষফল, কয়েক কোটি বছরের ব্যবধানে উভচরের আবির্ভাব।

সিলুরিয়ান এবং ডিভোনিয়ান, এই দুই যুগে স্থলজ উদ্ভিদেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সে উদ্ভিদও উচ্চশ্রেণীর ছিলনা। শৈবালের প্রাধান্য অব্যাহতই ছিল। তবে নগ্নবীজী উদ্ভিদের যাত্রা শুরু হয় উক্ত সময়কালের মধ্যে।

ডিভোনিয়ান যুগের পরে আসে কারবনিফেরাস যুগ। এই যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আধুনিক কালে খনি থেকে আমরা যে কয়লাকে উত্তোলন করছি, সেগুলি উক্তযুগে আবির্ভূত উদ্ভিদের জীবাশ্ম। কারবনিফেরাস যুগেই ডাঙায়

এসেছিল কোমলকাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং এমনভাবে বংশ বিস্তার করেছিল যে সমস্ত স্থলভাগকে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল।

আগেই বলা হয়েছে, কারবনিফেরাস যুগকে বিজ্ঞানীরা দুটি উপযুগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে চিহ্নিত করেছেন মিসিসিপিয়ান নামে এবং দ্বিতীয় ভাগকে পেনসিলভেনিয়ান নামে। পরবর্তী পার্মিয়ান যুগকে একসঙ্গে নিয়ে কেউ কেউ উক্ত পর্যায়কে প্যালিওজোয়িক মহাযুগের শেষ পর্যায়রূপে চিহ্নিত করে থাকেন।

কারবনিফেরাস যুগের প্রারম্ভে পৃথিবীর উপরিভাগটা ছিল যথেষ্ট আর্দ্র এবং আবহাওয়াটা ছিল বেশ মনোরম। তথাপি বাতাসে কারবন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল আজকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। উক্ত পরিবেশ উদ্ভিদের উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর্দ্র আবহাওয়া এবং পর্যাপ্ত কারবন ডাই অক্সাইড লাভ করায় উদ্ভিদদের খাদ্য প্রস্তুত করতে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তাই সেদিনের গাছগাছড়া আজকের যে কোন বনস্পতি অপেক্ষাও ছিল বহুগুণে উঁচু এবং স্থল-ভাগের সর্বত্রই সৃষ্টি হয়েছিল গহন অরণ্যানী। এমন ঘন সে অরণ্য ছিল যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণও তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতো না। জীব-জন্তুর একেবারে অগম্যস্থান।

গহন অরণ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য বহু জাতের পতঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল এই যুগে। উভচর প্রাণীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আর প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল সরীসৃপ। অবশ্য এযুগটি সরীসৃপের যুগ নয়। প্রথম আবির্ভাব কাল রূপেই ধরা হয়। আকারেও তারা বিশেষ বড় ছিল না। নানা স্থানে পাওয়া গেছে এই যুগের ছোট ছোট সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল।

সমুদ্রে মাছের প্রাধান্য পূর্বের মতই ছিল। তবে আকারে অনেকে বড় হয়ে উঠেছিল। তথাপি বিজ্ঞানীরা উক্ত যুগকে মৎস্যযুগ না বলে উদ্ভিদ ও উভচর প্রাণীর যুগ রূপে চিহ্নিত করেছেন। প্যালিওজোয়িক মহাযুগের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদিও মাছের প্রাধান্য, তথাপি মৎস্য যুগ বলতে ডিভোনিয়ান যুগকে চিহ্নিত করা হয়।

কোন কোন জায়গা থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্মকে দেখে বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেছেন, মিসিসিপিয়ান যুগেই সমুদ্রে তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছ তথা হাঙ্গর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ডাঙায় এসেছিল নানাপ্রকার মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা ও শতপদী প্রাণী। শামুক ও অন্যান্য উভচর প্রাণীরা স্থল-ভাগের জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। আর সে যুগে যে সব সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

প্যালিওজোয়িক মহাযুগের শেষভাগ পার্মিয়ান যুগকে অনেকে তুষার যুগ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা অন্য কোন কারণে পৃথিবীর পূর্ববর্তী মনোরম পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। যে কোন কারণে হানা দিয়েছিল তুষার যুগ। তখন সারা পৃথিবীটাই ঢেকে যায় তুষারের দ্বারা। এই পরিস্থিতিতে ডাঙায় যে আকাশছোঁয়া বৃক্ষ-রাজি এসেছিল তারা চাপা পড়লো তুষার স্তূপের মধ্যে। এতকাল ধরে বিবর্তনের ধারায় যে সমস্ত জলচর, উভচর ও স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদেরও অধিকাংশ হয়ে গেল লুপ্ত। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে পুরাতনকে মুছে ফেলে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টির আগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তবে সবকিছু যে নিঃশেষে মুছে গেল, এমন নয়। স্থলভাগের কোন কোন জায়গায় টিকে থাকলো অল্পসল্প জীব ও উদ্ভিদ। উপরটা বরফে আবৃত হয়ে গেলেও সমুদ্রের তলদেশে জল থেকে গেল। তাই সমুদ্র জলচর প্রাণীও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। পরবর্তীকালে অর্থাৎ তুষার যুগ অপসারিত হলে জলে স্থলে অবশিষ্ট জীব ও উদ্ভিদ পুনরায় বংশ-বিস্তারের দ্বারা ঢেকে ফেলেছিল পৃথিবীকে এবং তাদের বিবর্তনের ধারাটিও ছিল অব্যাহত।

সমগ্র পার্মিয়ান যুগটিই পৃথিবীর এক রুক্ষ ও বন্ধ্যা পরিবেশ। কয়েক লক্ষ বছর পরে পুনরায় যখন পৃথিবীর আবহাওয়া জীব ও উদ্ভিদবাসের অনুকূল হলো তখন দেখা গেল সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশ। অর্থাৎ

পূর্বের পরিবেশের সঙ্গে কোন মিল থাকলো না। সে এক আশ্চর্য ধরণের পরিবর্তন! আর পরিবেশের পরিবর্তন জীব এবং উদ্ভিদ দেহেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। দেখা দিল নতুন জীব ও উদ্ভিদ। কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল পূর্বের সেই কোমল কাষ্ঠযুক্ত সরল বৃক্ষশ্রেণী, পরিবর্তে জন্মগ্রহণ করলো কঠিন কাষ্ঠযুক্ত উদ্ভিদ। জীবদেহেও এলো নানা পরিবর্তন।

পার্মিয়ান যুগের বিশাল এই পরিবর্তনকে অনেকে বিরাট এক বিপর্যয় হিসাবে গণ্য করে থাকেন। তাঁদের মতে কী পৃথিবীর পরিবেশ, কী জীব ও উদ্ভিদ, সবকিছুই ওলোট-পালট করে দিয়েছিল। যেন পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়েছিল বিরাট এক বিপ্লব। সে বিপ্লবের তুলনা কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞানীরা তাই এই বিপর্যয়টির নামকরণ করেছেন "অ্যাপালাকিয়ান বিপ্লব"। বিপর্যয়ের পর আবার যখন নতুন পরিবেশ লাভ করলো পৃথিবী তখনই তৃতীয় মহাযুগের সমাপ্তি এবং চতুর্থ মহাযুগের সূত্রপাত।

মেসোজোয়িক মহাযুগ—

পৃথিবীর বুকে চতুর্থ মহাযুগ বা মেসোজোয়িক মহাযুগকে বিশেষজ্ঞরা তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। যুগ তিনটি যথাক্রমে ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেসিয়ান। উক্ত যুগগুলিকে একত্রে অতিকায় সরীসৃপদের যুগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায় বার কোটি বছর ধরে অপ্রতিহত গতিতে সরীসৃপরা চালিয়েছিল তাদের রাজত্ব। তারপর উক্ত মহাযুগের শেষের দিকে এদেরও ঘটে বিলুপ্তি। প্রকৃতি একদিন নিজের খেয়ালে ওদের আমদানি করেছিলেন, আবার সরিয়েও দিয়েছেন যেন আপন খেয়ালেরই বশবর্তী হয়ে। হয়ত কারও একাধিপত্য তিনি সহ্য করতে পারেন না বলেই। কেবল ভবিষ্যতের জীবদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপন অস্থির মধ্যে ধারণ করে আছেন তাদের চিহ্নটুকু।

যদিও সমস্ত মেসোজোয়িক মহাযুগটিকে সরীসৃপদের সুবর্ণযুগ রূপে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা তথাপি সর্বশ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল এই মহাযুগে। সরীসৃপ ব্যতীত অন্য যাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তারা

হল মৎস্য, উভচর ও পক্ষী। অপরদিকে স্তন্যপায়ীদেরও আগমন হয়েছিল উক্ত মহাযুগের শেষের দিকে। সরীসৃপদের সুবর্ণযুগ বলার অর্থ, সেকালে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিচরণ করতো ঐ সরীসৃপরাই। অন্যদের আধিপত্য বা প্রাধান্য আদৌ ছিল না।

অদ্ভুত ছিল ঐ সরীসৃপরা। ওরা জলে সাঁতার কাটতে পারতো, স্থলেও বিচরণ করতো। আবার এমন একশ্রেণীর সরীসৃপের উদ্ভব হয়েছিল, যারা আকাশে উড়তে পারতো, জলে সাঁতার কাটতে পারতো এবং স্থলে ঘুরে বেড়াতেও পারতো। অথচ পাখী তারা ছিল না। কারণ, আজকের মত পালকবিশিষ্ট পাখীর আবির্ভাব হয়নি সেকালে। ওরা আকৃতিতে ছিল বিরাট, মুখে ছিল সুতীক্ষ্ণ এবং বেশ বড় বড় দাঁত, পাখা ছিল পাতলা চামড়ায় ঢাকা।

বিজ্ঞানীরা মেসোজোয়িক মহাযুগকে অসম্ভবের যুগ হিসাবেও নির্দেশ করে থাকেন। উক্ত নামকরণের অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ সে যুগের ঐ সরীসৃপরা এত বৃহৎ ছিল যে আমরা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারি না। তদুপরি ডাঙায়ও সৃষ্টি হয়েছিল কঠিন কাষ্ঠযুক্ত সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর গহন অরণ্যানী। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মহাযুগে আবির্ভূত সরীসৃপরা স্থলে, জলে, এমনকি আকাশেও ঘুরে বেড়াতে পারতো। তৃতীয়তঃ আকাশে যারা উড়তো তারা পাখী ছিল না। আমরা জানি, পাখীদের দাঁত থাকে না। কিন্তু ওদের ছিল। পাখীরা মাটিতে ঘুরে বেড়াতে পারলেও জলে সাঁতার কাটতে পারে না। কিন্তু ওরা তাও পারতো।

উড়ন্ত সেই সব সরীসৃপদের বিজ্ঞানীরা পাখীদের পূর্বপুরুষ রূপেই চিহ্নিত করেছেন। ওদের অনেকের জীবাশ্মও লাভ করেছেন তাঁরা। সবচেয়ে পুরানো যে উড়ন্ত সরীসৃপের নমুনা তাঁরা পেয়েছেন সেটির নাম হলো আর্কেওপ্‌টিরিক্স। এটি একটি গ্রীক শব্দ, যার বাংলা করলে হয় প্রাচীন পাখী। ওর কঙ্কাল দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, ওদের লেজটা ছিল সরীসৃপদের মত। পাখাগুলি ছিল হাড় ও মাংস দিয়ে গড়া। পালক ছিল না বললেও চলে। পা দুটি ছিল বেশ লম্বা লম্বা। তাছাড়া হাতের মতও দুটি অঙ্গ ছিল। দেহের অনুপাতে ঠোঁট ছিল

বেশ বড়। তাতে থরে থরে সজ্জিত ছিল সুতীক্ষ্ণ দন্ত।

টেরোড্যাকটাইল নামে আর একজাতের পাখীরও নমুনা সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এরাও দৈর্ঘ্যে ছিল বেশ বড়। পাখায় পালক নামে মাত্র ছিল। জলে-স্থলে-আকাশে এরাই ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারতো। আর সুতীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত চঞ্চুও ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, আকাশে উড়তে পারলেও এইসব প্রাণীদের পাখী বলে স্বীকার করেন না পণ্ডিতেরা। কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন, এদের দাঁত ছিল, গলদেশ ছিল খাটো এবং গলদেশের হাড়ের গ্রন্থিগুলি ছিল অল্প। ওদের অনেকের ছাপ বহু স্থানে পাথরের গায়ে পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, ওদের পাখা ছিল অনেকটা আজকের দিনের বাদুড়ের মত। অথচ লম্বায় ছিল বিরাট। ওদের আস্ত কঙ্কালখানাও আবিষ্কৃত হয়েছে কোথাও কোথাও। তাতে দেখা গেছে, কেবল ঘাড়টাই ছিল পাঁচ ফুটের মত লম্বা। পাখাজোড়ার বিস্তৃতি ছিল প্রায় পনের ফুট। এতবড় খেচরের কথা আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না। যেন ছোটখাট এক একটি উড়োজাহাজ কিংবা পুরাণবর্ণিত বিনতানন্দন গরুড়। পরা মাংসাশী ছিল বলেও অনেকের অনুমান। যাই হোক ওদের পাখীর অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও খেচর এসে ছিল উক্ত মেসোজোয়িক মহাযুগে।

এবার ডাঙার জীবদের কথা ধরা যাক। এখানেও ছিল সরীসৃপদের প্রাধান্য এবং প্রতিটি সরীসৃপ ছিল অতিকায়। বিশেষ করে গলাটা ছিল অসম্ভব রকমের লম্বা। পুরো শরীরটা ছিল যতখানি লম্বা, গলাটাও ছিল ততখানি। আর দেহের অনুপাতে মাথাটা ছিল নিতান্ত ছোট। এত লম্বা তাদের গলা ছিল যে, আজকের দিনে সবচেয়ে উঁচু তালগাছটার মগডাল থেকে অক্লেশে পাতা ছিঁড়ে আনতে পারতো। ওদের সঙ্গে তুলনা করলে আজকের জিরাফের এত লম্বা গলাও তুচ্ছ মনে হবে। জলে-স্থলে সর্বত্র ছিল সমান গতি। বিজ্ঞানীরা অতীতের এই সরীসৃপদের "ডাইনোসোর" শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

ডাইনোসোররা ছিল বহু জাতের। পৃথিবীর বহু দেশেই পাওয়া

গেছে ওদের কঙ্কাল। সমস্ত কঙ্কালই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইংলণ্ডের কোন একটি জায়গায় একজাতীয় ডাইনোসোরের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন, এদের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পঞ্চাশ ফুট। বিজ্ঞানীরা এইজাতীয় ডাইনোসোরদের নাম রেখেছেন মেগালো-সৌরাস। এইজাতের ডাইনোসোরের কঙ্কাল ভারতবর্ষ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে পাওয়া গেছে।

আর এক জাতীয় ডাইনোসোরের নাম ছিল ব্রোণ্টোসৌরাস। এদের শরীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৭০ ফুটের কাছাকাছি। তাছাড়া আটল্যাণ্টো-সৌরাস, আল্লোসৌরাস, টিরানোসৌরাস, স্টিগোসৌরাস প্রভৃতি নানা জাতের ডাইনোসোরের উদ্ভব হয়েছিল সে সময়ে। তাদের কারও কারও দৈর্ঘ্য ছিল ১১৫ ফুটের মত। দাঁত ছিল সবারই। তবে অনেকেই ছিল তৃণভোজী।

ডাইনোসোরদের আবির্ভাব বিজ্ঞানীদের নিছক কল্পনা নয়। পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে পাওয়া গেছে ওদের আস্ত কঙ্কাল। ভারতবর্ষ থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে প্রায় ১৬ কোটি বছর আগেকার এক অতিকায় ডাইনোসোরের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ভারতের মাটি থেকেই লাভ করেছেন। নাম রেখেছেন বরাপোসরাস টেগোরাই। উক্ত প্রতিষ্ঠান কঙ্কালটিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণও করছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে অতিকায় সরীসৃপদের যে সব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে সেই কঙ্কালদের মধ্যে কোন কোনটির দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ১২০ ফুটের কাছাকাছি। এত বৃহৎ জানোয়ারের কথা যেন ভাবাই যায় না। সে সময় যে সমস্ত ডাইনোসোরদের শরীরের দৈর্ঘ্য বেশি ছিল বিজ্ঞানীরা তাদের নাম রেখেছেন ব্রোণ্টোসৌরাস। সরীসৃপদের রাজা বলেও অভিহিত করেন কেউ কেউ। ডিপ্লোডাকাস নামে আর এক-জাতের সরীসৃপরাও দৈর্ঘ্যে বেশ বড় ছিল।

আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছিল সেকালে। গ্লিপটোডোন নামে এক ধরণের কচ্ছপ ছিল, যাদের পিঠটা

একতলা একটা বাড়ীর মত ছিল উঁচু। ডাঙায় ঘুরে বেড়াতো তারা। আর্কেয়েগোসৌরাস নামে এক অতিকায় জলচর জীব শ্বাসগ্রহণের জন্য ডাঙায় উঠে আসতো এবং শ্বাস নিয়ে পুনরায় নেমে যেতো জলে।

ডাঙার মত সেকালে সমুদ্রেও এসেছিল অতিকায় জীব। ইংলণ্ডে ইকথওসৌরাস নামে একজাতীয় অতিকায় জীবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কঙ্কালটির দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট। অনেকে কঙ্কালটি দেখে অনুমান করেছেন, এরা সমুদ্রে বাস করতো। কিন্তু ডাঙায়ও উঠে আসতো মাঝে মাঝে। আজকের দিনে অতিকায় সামুদ্রিক জীব তিমিদের থেকেও তারা ছিল দীর্ঘ। কারও কারও মতে উক্ত ইকথওসৌরাসই হাঙ্গরদের পূর্বপুরুষ।

মেসোজোয়িক যুগের প্রথমভাগ অর্থাৎ ট্রায়াসিক যুগটি ছিল একমাত্র সরীসৃপদের রাজত্বকাল। বহু জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। তাই ডাইনোসোরদের কথা কল্পকাহিনী নয়।

মেসোজোয়িক মহাযুগের দ্বিতীয় ভাগ জুরাসিক যুগেও ছিল সরীসৃপদের আধিপত্য। আগে যে উড়ন্ত সরীসৃপদের কথা বলা হয়েছে, তাদের আবির্ভাব মনে হয় এই জুরাসিক যুগে। পাখীদের পূর্বপুরুষ এই যুগের শেষের দিকেই আবির্ভূত হয়েছিল। জার্মানীতে এক জায়গায় সোলোহফনের চুনাপাথরের স্তরে একজাতীয় সরীসৃপ পাখীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ববর্ণিত উড়ুক্কু সরীসৃপদের সঙ্গে এদের চেহারার অনেকটা মিল থাকলেও ডানায় নখ ছিল। লেজটা ছিল লম্বা কিন্তু তলদেশ ছিল সুন্দর পালকে আচ্ছাদিত। চুনাপাথরের গায়ে ভারি চমৎকার ছাপ পড়েছে। তবে দাঁত যে ছিল সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই পাখী এরাও ছিল না। পাখীর পূর্বপুরুষই বলা যেতে পারে।

মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষ অধ্যায় ক্রিটাসিয়াস যুগ। এই যুগের শেষের দিকে পূর্ববর্ণিত অতিকায় সরীসৃপদের বিলুপ্তি ঘটে। প্রাকৃতিক নিয়মে যে স্বল্প সংখ্যক কোনপ্রকারে নিজ অস্তিত্বকে বজায় রেখেছিল তাদের মধ্যেও এসেছিল চরম পরিবর্তন।

স্থলচর সরীসৃপদের মত উড়ন্ত সরীসৃপরাও সে পরিবর্তন থেকে রক্ষা পায়নি। তারাই ধীরে ধীরে উক্ত সময়কালের মধ্যে পাখীতে

রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই বিরাট চঞ্চু, সেই বিশাল শরীর কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। লম্বা ঘাড় ও লম্বা লেজ হয়ে গেল সঙ্কুচিত। তৎপরিবর্তে পাখায় ও গায়ে গজিয়ে উঠলো চমৎকার রং বেরঙের পালক। চঞ্চুও ছোট হয়ে গেল, দাঁতও আর থাকল না। একেবারে আমূল পরিবর্তন যাকে বলে।

আমূল পরিবর্তন এসেছিল স্থলচর প্রাণীদের মধ্যেও। অবলুপ্ত হল সরীসৃপ। জননী বসুন্ধরার কোলে এল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আর এক জাতীয় জীব। ওরাই উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর পূর্বপুরুষ। ক্রিটাসিয়ান যুগ অবলুপ্তির যুগ হলেও, ঐ একটি কারণে ওর গুরুত্ব অসাধারণ। অণ্ডজ সরীসৃপকে বিদায় দিয়ে আমদানি করেছিল স্তন্য-পায়ীদের—যার চরম পরিণতি ঘটেছে পরবর্তী মহাযুগে।

এক ধ্বংসকাল থেকে আর এক ধ্বংসকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যুগ ও মহাযুগের বিভাগ করেছেন। সৃষ্টি হচ্ছে। আবার পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃতি নতুনের আমদানি করছে। আরও বৈশিষ্ট্য, ঐ ধ্বংসের মধ্যেই সূত্রপাত হচ্ছে নবীনের। তবে মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষ পর্যায়ে তথা ক্রিটাসিয়ান যুগে কেন যে ধ্বংস এসেছিল, সে কথা বিজ্ঞানীরা ঠিকমত বলতে পারেন না। অনেকের বিশ্বাস, প্যালিও-জোয়িক মহাযুগের শেষে অর্থাৎ পার্মিয়ান যুগে যেমন তুষার যুগের সূচনা হয়েছিল তেমনটি উক্ত সময়ে আসেনি। তবে আবহাওয়ার যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল সে সম্বন্ধে প্রায় সবাই একমত। একদিকে অতিকায় ডাইনোসোরদের দ্রুত বংশবিস্তারের ফলে সূচিত হয়েছিল খাদ্যাভাব। অপরদিকে যে পরিবেশের মধ্যে তারা কালযাপন করতো সেই পরিবেশেরও এলো পরিবর্তন। অনেকে সে পরিবেশকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলো না। গ্রহণ করলো না বিকল্প খাদ্য, পরিবর্তন করলো না পুরানো স্বভাব, আগ্রহ প্রকাশ করলো না নতুনকে বরণ করে নিতে। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছিল তাদের।

সবাই সেই সরীসৃপদের মত গোঁয়ার ছিল না। আবার যদি বা কোন বিপর্যয় এসে থাকে, তাও একদিনে আসেনি। সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত

হয়ত কয়েক লক্ষ বছরের ব্যবধান। উক্ত ব্যবধানে যে সব জীব পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিল তারাই তাদের অস্তিত্বকে সঞ্চারিত করেছিল ভবিষ্যৎ বংশধারার মধ্যে। পরিবেশের প্রভাব তাদের বংশধারার উপরও প্রতিফলিত হলো। হাজার হাজার পুরুষের বিবর্তনের ফলে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল তাদের আকার, প্রকৃতি, প্রভৃতি সবকিছু। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে তাদের রক্তকে শিরায় বহন করে আবির্ভূত হল আর একদল কুশীলব। আর এইখানেই যবনিকা পাত হল মেসোজোয়িক মহাযুগের। সম্ভবত পৃথিবীর বুকে একটানা উষ্ণ প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার জন্য বিশেষ পরিবর্তনটি সূচিত হয়েছিল। পরিবর্তন এসেছিল বায়ুমণ্ডলে অবস্থানকারী গ্যাসগুলির মধ্যেও।

কেনোজোয়িক মহাযুগ—

কেনোজোয়িক মহাযুগই পঞ্চম মহাযুগ। এর সূচনা হয়েছিল আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে এবং এখনও চলছে এই মহাযুগটি। বিজ্ঞানীদের মতে, এই মহাযুগের উপর দিয়ে বেশ কয়েকবার তুষার ঝড় বয়ে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী তুষার যুগও এসেছিল কয়েকবার। উক্ত মহাযুগের বহু জীবাশ্ম হস্তগত হওয়ায় মহাযুগটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে প্রথম দিকের জীবাশ্ম আশানুরূপ পাওয়া যায়নি। তাই উক্ত যুগের সূচনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন।

বিশেষজ্ঞরা কেনোজোয়িক মহাযুগকে যুগে ভাগ না করে ইপোকে ভাগ করেছেন। কারণ, এ যুগের সমাপ্তি এখনও হয়নি। সাত কোটি বছরের ইতিহাস উক্ত মহাযুগটির। ৬টি ইপোকে বিভক্ত। ইপোকগুলি যথাক্রমে এওসিন, ওলিগোসিন, মিওসিন, প্লিওসিন, প্লিস্টোসিন এবং রিসেন্ট বা সাইকোজোয়িক। এই মহাযুগকে সর্বতোভাবে স্তন্যপায়ীদের যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেনোজোয়িক মহাযুগের প্রথমভাগ অর্থাৎ এওসিন যুগের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। পূর্ববর্তী মহাযুগের শেষে যে উষ্ণপ্রবাহের সূচনা হয়েছিল তা এই যুগে আরও বাড়তে থাকে। ফলে পৃথিবীর আর্দ্রতা ধীরে ধীরে

কমতে থাকে এবং নানা স্থান মরুভূমির মত শুষ্ক ও রুক্ষতায় ভরে যায়। যে সব জায়গায় কিছুটা আর্দ্র পরিবেশ থাকলো সেখানে গাছপালা জন্ম নিলেও পূর্বের মত আর আকাশছোঁয়া হতে পারলো না। ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে গেল অবয়ব। অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে সৃষ্টি হলো তৃণভূমির। প্রকৃতপক্ষে স্থলভাগের বৈশিষ্ট্যেরও সূচনা হয় এই যুগে। আগে পৃথিবী ছিল যথেষ্ট আর্দ্র। সারা স্থলভাগ জুড়ে বিরাজ করতো অরণ্য। এওসিন যুগের শুষ্ক পরিবেশ বহু অরণ্যকে করলো নির্বাসিত। সৃষ্টি করলো মরুভূমি, তৃণভূমি প্রভৃতির।

স্থলভাগ ও বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের ফলে প্রাণীদের মধ্যেও এলো পরিবর্তন। আবির্ভূত হলো স্তন্যপায়ী লোমশপ্রাণী। বহু আগে অধিকাংশ ডাইনোসোরদের বংশ নির্মূল হয়ে গেছিল। যে দু-এক জাতের টিকে ছিল তাদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যেও সূচিত হলো পরিবর্তন। বিবর্তনের ধারায় অন্য জন্তুতে হলো রূপান্তরিত। অনেকের মতে, আজকের দিনে জলে ও স্থলে বিচরণ করার মত ক্ষমতাযুক্ত বিশাল জলহস্তীরা সেই যুগের অতিকায় কোন একটি জীবের বংশধর। হাতীদের ক্ষেত্রেও উক্তিটি প্রযোজ্য।

এওসিন যুগে সমুদ্রের তীরভূমিতে কিছু কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জন্তুর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের মধ্যে যাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তারা হলো খড়্গাদন্তী ব্যাঘ্র, অতিকায় সিংহ, ভল্লুক, গণ্ডার, জলহস্তী, ম্যামথ প্রভৃতি। ম্যামথ ছিল বিশাল বিশাল দন্তবিশিষ্ট লোমশ হাতী। এরাই বর্তমান কালের অরণ্যচারী ভয়ঙ্কর জন্তুজানোয়ারদের পূর্বপুরুষ।

সমুদ্রে ও নদীতে হাঙ্গর ও কুমীরেরাও আসে এই এওসিন যুগে। তাছাড়া চিতাবাঘ, নেকড়ে, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুজানোয়ারদেরও এই কালে আবির্ভাব হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এওসিন যুগের শেষের দিকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কের ক্রমবিস্তৃতি লাভ করে এবং উক্ত কারণে তাদের মানসিকতারও উন্নতি ঘটে। ফলে আরও উন্নত ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব হয় এবং তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায় প্রাচীন স্তন্যপায়ী

তথা অনুন্নত মানসিকতাসম্পন্ন প্রাণীরা। এক কথায় নতুন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রাজত্ব শুরু হয় এওসিন যুগের শেষাংশ থেকে।

এওসিন যুগের পরে ওলিগোসিন ও মিওসিন যুগগুলিতে পৃথিবীতে শুষ্কতার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আগে বৃক্ষলতাদির পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতো। শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন বৃক্ষলতাদির বৃদ্ধির পরিমাণ ব্যাহত হওয়ায় এবং অপরদিকে তৃণভূমির সৃষ্টি হওয়ায় পশুরা তাদের খাদ্য-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। সেই থেকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে থাকে তৃণকে।

প্লিওসিন যুগে শুরু হয় তুষার যুগ; ততদিনে পৃথিবীর নানা স্থানে উদ্ভব হয়েছে বিরাট বিরাট পাহাড়ের। একদিকে পৃথিবীর শীতল পরিবেশ, অন্যদিকে পাহাড় পর্বতের বাধা, প্রাণীরা বসবাসের জন্য সুবিধাজনক জায়গা অনুসন্ধান করতে গিয়েও ব্যর্থ হল। দুর্লঙ্ঘ পর্বতকে অতিক্রম করতে সক্ষম হল না। বহু প্রাণীকে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে হল। অন্যান্য স্থানে যে সব জীবজন্তুরা ছিল জীববাসের অনুপযোগী পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে পারলো না। তাদেরও অধিকাংশ হলো লুপ্ত। জীবনযুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যারা এগিয়ে যেতে পারলো, কেবল তারাই টিকে গেল।

পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মেসোজোয়িক মহাযুগের মত না হলেও বেশ কিছু অতিকায় প্রাণীর বংশধর ছিল। তাদের মধ্যে দেখা গেল দারুণ খাদ্যাভাব। বাঁচার লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা খাদ্যের পরিবর্তন ঘটালো। ছোট ছোট অসহায় ও দুর্বল প্রাণীরা তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধার কাছে টিকতে পারলো না। কত প্রাণী যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার হিসেব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চরম ধ্বংসের মধ্যে কিছুটা শুভেরও ইঙ্গিত থাকে। প্লিওসিন যুগের সেই চরম দুর্যোগের মধ্যেও এক শুভ সূচনা হলো অর্থাৎ কয়েক কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় এবং পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনে একশ্রেণীর উন্নত মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট লোমশ বানর-জাতীয় জীবের হলো আবির্ভাব। কালক্রমে এরাও নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে

ঠিকমত ধরে রাখতে পারেনি। পরিবেশের পরিবর্তনে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই শুভ সময়ের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিনশ' কোটি বছর আগে। অর্থাৎ ঐ সময়ের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ আসার পথটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

প্লিওসিন যুগের শেষের দিকে পৃথিবীর আবহাওয়া কিছুটা মনোরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী প্লিস্টোসিন যুগে পুনরায় শুরু হয় তুষার যুগ। বারে বারে প্রবাহিত হতে থাকে শৈত্যপ্রবাহ। পণ্ডিতদের মতে উক্ত প্রবাহগুলি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কয়েক হাজার বছর অন্তর অন্তর বেশ কয়েকবারই হানা দিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে বরফাচ্ছাদিত হয়ে যেতো পৃথিবী। তবে অন্তর্বর্তী সময়কালে কিছুকালের জন্য উষ্ণ আবহাওয়াও আসতো। ফলে জীবের বংশবিস্তারে প্রচণ্ড বাধা এলেও বহু প্রজাতি টিকে থাকতে পেরেছিল।

কিছু কিছু প্রাণী আবার শীতলতম স্থান পরিত্যাগ করে উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ সাইবেরিয়া অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অত্যধিক শৈত্যপ্রবাহ সহ্য করতে না পেরে দূর দেশে পাড়ি দিয়েছিল। হয়ত সুবিধাজনক স্থানের খোঁজে দলে দলে স্থলভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর। একরকম যাযাবর হয়ে উঠেছিল তারা। পণ্ডিতদের অনুমান, বর্তমানকালে আফ্রিকা মহাদেশে আজকাল যে সব হরিণ, গণ্ডার, জলহস্তী প্রভৃতিকে দেখতে পাই, তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল ইউরোপের বাসিন্দা। অত্যধিক শীত সহ্য করতে না পেরে তারা তাদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছিল আফ্রিকায়। যেহেতু নিরক্ষীয় অঞ্চল, তাই এখানে শৈত্যের প্রাবল্য বিশেষ ছিল না। বিরাট বনভূমি এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ছিল সুদূর বিস্তৃত তৃণভূমি। অতএব স্থায়ীভাবেই বসবাস আরম্ভ করে দিয়েছিল আগন্তুক পশুরা।

তা সত্ত্বেও বহু প্রাণীর যে অবলুপ্তি ঘটেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু উন্নত মানসিকতার জন্য মানুষের পূর্বপুরুষ প্লিওসিন যুগে

ভূমিষ্ঠ উন্নত বানররাই অধিকাংশ টিকে ছিল এবং বংশবিস্তার অব্যাহত রেখে ছিল। অপরাপর প্রাণীদের তুলনায় ওদের বুদ্ধিটা একটু বেশি ছিল। উক্ত কারণে আগেই তারা খুঁজে নিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়েও পড়েছিল বহু জায়গায়।

এই অবস্থায় তারা প্রকৃত বানরই ছিল। চার পায়ে ভর করে হাঁটতো, বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করে রাত্রি-যাপন করতো, গাছের ফল-পাতা খেতো। দৈহিক গঠনটাও ছিল গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবার উপযোগী।

তারপরেও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কত লক্ষ লক্ষ বছর। নানাভাবে পরিবর্তন এসেছে পরিবেশের। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব দল বাস করতো, তাদের মধ্যেও দেখা দিল পরিবর্তন। কারও কারও মানসিকতার হলো আরও উন্নতি। আরও উদ্ভব হলো কত রকমের বানর জাতীয় জীব। সর্বশেষে কোন কোন দলের অভূতপূর্ব মানসিক উন্নতির ফলই মানুষের পূর্বপুরুষ রূপে উত্তরণ।

শেষ তুষার যুগ অপসারিত হওয়ার পরই একরকম মানুষের যুগ শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকেই পৃথিবীর বুকে আরম্ভ হয়ে যায় মানুষের সদম্ভ পদচারণা। শুরু থেকে এই যুগকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন সাইকোজোয়িক মহাযুগ—একটানা মানুষের উন্নতির যুগ।

মহাযুগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

মহাযুগ (১)	যুগ (২)	প্রাণী (৩)	উদ্ভিদ (৪)
১। আর্কিও-জোয়িক (৫০ কোটি বছর)	কোন যুগবিভাগ নেই	কোন প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি	কোন উদ্ভিদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি
২। প্রোটেরো-জোয়িক (৯০ কোটি বছর) ব্যাকটীরিয়ার যুগ	কোন যুগবিভাগ নেই	খোলসযুক্ত প্রাণী, স্পঞ্জ, একনালী দেহী প্রাণী ও কৃমি	জলজ সবুজ শৈবাল ও ব্যাক-টীরিয়া

মহাযুগ (১)	যুগ (২)	প্রাণী (৩)	উদ্ভিদ (৪)
৩। প্যালিও-জোয়িক (৩৬ কোটি বছর) মৎস্য যুগ	(ক) ক্যাম্ব্রিয়ান	অমেরুদণ্ডী প্রাণী	সামুদ্রিক শৈবালের বিস্তৃতি,
	(খ) অর্ডো-ভিসিয়ান	মৎস্যের উৎপত্তি, প্রবাল ও ট্রাইলো-বাইটের প্রাধান্য	সামুদ্রিক শৈবালের প্রাধান্য
	(গ) সিলুরিয়ান	মৎস্যের বিস্তার ও সন্ধিপদ প্রাণীর বিস্তার	স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব
	(ঘ) ডিভোনিয়ান	উভচরের আবির্ভাব ও মৎস্যের প্রাধান্য	স্থলজ উদ্ভিদের প্রতিষ্ঠা ও নগ্ন-বীজীর উদ্ভব
	(ঙ) কারবনি-ফেরাস	মৎস্য ও উভচরের প্রাধান্য, পতঙ্গের বিস্তৃতি ও সরী-সৃপের আবির্ভাব	নগ্নবীজীদের প্রাধান্য ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব
	(চ) পার্মিয়ান	প্রাচীন স্থলচর ও জলচর প্রাণীর বিলুপ্তি এবং সরী-সৃপদের বিস্তার	ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস
৪। মেসোজোয়িক (১২ কোটি বছর) সরীসৃপের যুগ	(ক) ট্রায়াসিক	সরীসৃপদের প্রাধান্য	ফার্ণদের অবলুপ্তি
	(খ) জুরাসিক	অতিকায় সরীসৃপ	দ্বিবীজপত্রীর আবির্ভাব,
	(গ) ক্রিটেসিয়ান	অতিকায় সরীসৃপ-দের বিলুপ্তি এবং স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ও বিস্তার	একবীজপত্রীর আবির্ভাব
৫। কেনোজোয়িক (৭ কোটি বছর) স্তন্যপায়ীর যুগ	(ক) এওসিন	প্রাচীন স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি, আধুনিক পাখীর উদ্ভব	আধুনিক উদ্ভিদের আবির্ভাব ও সপু-ষ্পক উদ্ভিদের প্রাধান্য
	(খ) ওলিগোসিন	উন্নত স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব	একবীজপত্রীর প্রতিষ্ঠা ও নির-ক্ষীয় অরণ্যের বিস্তার

মহাযুগ (১)	যুগ (২)	প্রাণী (৩)	উদ্ভিদ (৪)
	(গ) মিওসিন	উন্নত স্তন্যপায়ীর প্রতিষ্ঠা	উত্তর গোলার্ধে উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস ও নিরক্ষীয় বনভূমির বিস্তার
	(ঘ) প্লিওসিন	বানর জাতীয় জীবের আগমন	তৃণভূমির বিস্তার ও কোমল দ্বিবীজ-পত্রীর ক্রমবিকাশ
	(ঙ) প্লিস্টোসিন	অতিকায় স্তন্য-পায়ীর বিলুপ্তি ও মানুষের পূর্ব-পুরুষেরআবির্ভাব	উদ্ভিদের বহু প্রজাতির ধ্বংস ও কোমল উদ্ভিদের বিস্তার
	(চ) সাইকো-জোয়িক (রিসেন্ট)	মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ	কোমল উদ্ভিদের প্রাধান্য

পৃথিবীর পরিবেশের পরিবর্তন এবং জীবদেহে প্রভাব

কথায় বলে, জীব মাত্রই পরিবেশের দাস। যখন যেমন পরিবেশ আসে তখন সেইভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। তা না হলে নিরাপত্তা হয় বিঘ্নিত। পরিবর্তনশীল এই জগৎ। যুগে যুগে সূচিত হয়েছে কতই না পরিবর্তন। সেই আদিম পৃথিবীর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। দু-তিনশ' কোটি বছরের ধীর ও মন্থর পরিবর্তনে নিজের দেহকে শীতল করলো। নিমজ্জিত হলো জলের মধ্যে। বুকের দাহ আপন অশ্রুজলে নির্বাপিত করছে কয়েক শ' কোটি বছরের ব্যবধানে। সে এক বিরাট পরিবর্তন।

পরিবর্তিত পরিবেশে প্রাণপঙ্কের হলো উদ্ভব, পৃথিবীর বুকে একদিন আগমন হলো জীবের। কিন্তু সেই যে আদিকালের জীব, তারা সমান-ভাবে তাদের বংশধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। না পারার একমাত্র কারণ, পরিবেশের পরিবর্তন। পৃথিবী তার একই পরিবেশকে আঁকড়ে রাখতে পারেনি বলেই এমনটি হয়েছে। আর আঁকড়ে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যতদিন পৃথিবা থাকবে ততদিনই চলতে থাকবে পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন আবার কখনও কখনও অতি দ্রুত ও

ভয়ঙ্কর। আবার কখনও কখনও অতি ধীর ও মন্থর। ফলে পুরাতনের অবলুপ্তি এবং নতুনের আবির্ভাব। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন?

পৃথিবীর পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য দায়ী তার আবহাওয়া এবং তার অভ্যন্তর ভাগ। এমনিতে পৃথিবীর উপরিভাগের আবহাওয়া সর্বত্র সমান নয়। বিষুবপ্রদেশ উত্তপ্ত এবং মেরুদেশ অত্যন্ত শীতল। একমাত্র এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের উষ্ণতা মাঝারি অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ। তার উপর মেরুদেশ চিরকাল একই জায়গায় অবস্থান করছে না। তারও হয়েছে পরিবর্তন। ফলে বিষুব অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেরও হয়েছে পরিবর্তন।

যুগে যুগে পৃথিবীর আবহমণ্ডলেও এসেছে নানা পরিবর্তন। আদিতে মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাস যথেষ্ট ছিল। পরে আবহমণ্ডলে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু অক্সিজেন ছিল না বললেও চলে। বর্তমানে আবার আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেনের আধিক্য। আবহ-মণ্ডলের উক্ত গ্যাসগুলির হ্রাসবৃদ্ধি জীব ও উদ্ভিদ জগতের উপর নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ যে যুগে বাতাসে কারবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি ছিল, সে যুগে পৃথিবীর উপরিভাগটা আচ্ছাদিত হয়ে গেছিল গহন অরণ্যানীতে। স্থলচর জীবের সংখ্যা বেশি ছিল না। অক্সিজেনের পরিমাণ নিতান্ত অল্প থাকায় জীবরাও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ভবিষ্যতে আবহমণ্ডলেরও পরিবর্তন আসতে পারে। হয়ত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন এই বলদর্পী মানুষ সব জেনেও বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করে দিতে পারে। তার প্রতিক্রিয়া সদ্য সদ্য না এলেও ভবিষ্যতে অবশ্যই প্রাধান্য লাভ করবে। জীব ও উদ্ভিদ দেহেও আসবে পরিবর্তন।

অপর পক্ষে পৃথিবীর উপরিভাগটা স্বাভাবিক অবস্থায় এলেও অভ্যন্তর ভাগ এখনও অশান্ত। মাত্র চল্লিশ মাইলের তলদেশেই প্রচণ্ড তাপমাত্রা। সেখানে গলিত তরল পদার্থ অহরহ টগবগ করে ফুটছে। পরিস্থিতিটা তরল পদার্থে পূর্ণ একটা বেলুনের মত। বেলুনের দু-প্রান্তে একটু চাপ দিলেই মাঝখানটা ফেঁপে উঠে। আভ্যন্তরীণ যদি কোন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায় অথবা মহাকাশের কোন সূক্ষ্ম নিয়ম

অনুসারে (যা আজও মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি) পৃথিবীর আহ্নিক, বার্ষিক ও আয়ন এই তিন গতির মধ্যে কোন একটি গতির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে মেরুদেশেরও পরিবর্তন হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ফলে বিষুব প্রদেশে অথবা মেরু থেকে কিছুটা দূরে নতুন মেরুর উদ্ভব হতে পারে। তারই পরিণাম পৃথিবীর শীতল পরিবেশ বা তুষার যুগ। অন্যদিকে মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন ধূমকেতুর দেহাবশেষ যদি কোন প্রকারে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে তাহলেও আসে চরম বিপর্যয়।

তুষার যুগ কেন যে পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে হানা দেয়, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত নন। তবে তুষার যুগে বিশ্বাসী সবাই। উক্ত যুগে পৃথিবীর জীবন হয় বিপন্ন। সারা পৃথিবীটা বরফে বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্প না থাকায় পৃথিবী তাপ ধারণ ক্ষমতা হারায়। কেবলই বিরাজ করে শৈত্য প্রবাহ। হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যায় পৃথিবীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। পূর্বের পরিবেশ থাকে না, সে আবহমণ্ডলও পরিবর্তন হয়। আর পরিবর্তন আসে জীব ও উদ্ভিদ দেহে। প্রকৃতি দীর্ঘকাল ধরে কর্তব্য সম্পাদনের পর যেন কিছুটা সময় বিশ্রামের আয়োজন করেন। বিশ্রামের পরে নতুন কর্মক্ষমতা লাভ করেন, যেন নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হন।

এ পর্যন্ত মোট সাতটি শীতল যুগ বা তুষার যুগের সন্ধান লাভ করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই সাতটি যুগ যথাক্রমে প্রোটোরোজোয়িক, সিলুরিয়ান, পারমিয়ান, ট্রায়াসিক, ক্রেটাসিয়াস, এওসিন ও প্লিস্টোসিন। তবে বিজ্ঞানীরা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, তুষার যুগে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। অধিকাংশের অবলুপ্তি ঘটলেও কিছু সংখ্যক জীব ও উদ্ভিদ বিশেষ বিশেষ পরিবেশে থেকে যায়। পূর্বের মত তত দ্রুত বংশবিস্তার অবশ্য করতে পারে না। তথাপি বংশধারাটা কোন প্রকারে টিকে থাকে। তুষার যুগ অপসারিত হওয়ার পর পুনরায় পরিবর্তিত পরিবেশে দ্রুত বংশবিস্তার ঘটায়। ফলে নতুন নতুন

প্রজাতির উদ্ভব হয়। তবে এও সত্য যে, পরিবেশের পরিবর্তন না এলে হয়ত চিরকাল একই ধরণের জীব বিরাজ করতো। বিবর্তনের গতিও হতো মন্থর। উন্নত জীব মানুষের আসাও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

অতএব বলা যেতে পারে যে, আজকের এই পরিবেশেরও একদিন পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তিত হবে জীবদেহ। তুষার যুগও যে না-আসতে পারে এমন নয়। লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর পরিবেশ যখন স্বাভাবিক হয়ে আসবে তখন দেখা যাবে, আর এক পরিবেশ রচিত হয়ে গেছে। সেদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে গিয়ে অবশিষ্টের উপর ভিত্তি করে হয়ত উদ্ভব হবে আর এক নতুন ধরণের প্রাণী। প্রাণীদের আকার যে কেমন হবে বলা যায় না। পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হয়ত কোন নতুন অঙ্গ সংযোজিত হতে পারে এবং পুরাতন অঙ্গের বিলুপ্তি হতে পারে। বর্তমানের মানুষ আর সেদিনের উন্নত জীব এক হবে না। তবে উন্নত হবে আরও। আর যদি পুনঃ পুনঃ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সভ্যতা বিকাশের সুযোগ না পায় তাহলে ব্যাহত হবে তাদের উন্নতি।

বিবর্তনবাদ ও মহাত্মা ডারউইন

আগে মানুষ মাত্রই মনে করতো, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর নিজ দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন তাকে। তার পূর্বপুরুষ স্বয়ং ঈশ্বর। একদিনের জন্যও সে মনে করেনি যে, পৃথিবীতে জীবের বিবর্তনের ধারায় সে এসেছে এবং বিবর্তনের ধারা তাকেও মেনে চলতে হবে। কথাটি যিনি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন তিনি প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, "মানুষ ঈশ্বর সৃষ্ট আশ্চর্য জীব নয়। জীব জগতের ক্রম বিবর্তনের ফলেই তার আগমন।"

মহাত্মা ডারউইন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক। স্কুলের গণ্ডী পরিত্যাগ করে সব সময় তাঁর মন ছুটে যেতো

দূরে বহুদূরে শ্যামল বৃক্ষরাজির পানে, যেন হারিয়ে ফেলতেন নিজেকে। পাখীর কাকলিতে অনুভব করতেন অদ্ভুত এক শিহরণ। মুক এবং ইতর জীবজন্তুর সঙ্গেও একাত্ম হয়ে যেতে চাইতেন। যেন কিসের একটা যোগ, যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন না তিনি।

এতবড় প্রকৃতি-প্রেমিক হয়েও ডারউইন লেখাপড়ায় অবহেলা করতেন না। যখন হাতে কোন কাজ থাকতো না তখনই বেরিয়ে পড়তেন রাস্তায়। ঘুরতেন নদীর তীরভূমিতে, সবুজ বনের ধারে। নানাজাতের গাছপালা, রঙ বেরঙের পাখী, কীটপতঙ্গ সব কিছুই তাঁর মনকে হরণ করে নিতো। সেই নিতান্ত কম বয়সেই পশুপাখীর স্বভাব নিয়ে মাথা ঘামাতেন এবং কারও সঙ্গে কারও সাদৃশ্য আছে কিনা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতেন। কথিত আছে, সে সময় ডারউইন পশুপাখী সম্বন্ধে এমন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন যে ওদের সম্বন্ধে লেখা যেখানে যত বই ছিল সবই পড়ে ফেলেছিলেন। একদিন তাঁর হাতে আসে "ওয়াণ্ডার্স অব দি ওয়ার্ল্ড" বা অবাক পৃথিবী নামে একটি বই। বইটি তাঁর খুবই ভাল লাগে। বার বার বইটি পড়তে থাকেন এবং ভাবতে আরম্ভ করেন পৃথিবী সম্বন্ধে।

একদিন ডারউইন স্কুলের পাঠ সমাধা করে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শোনা যায়, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে "বীগল" নামে একটি জাহাজে চেপে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন পৃথিবী পর্যটনের উদ্দেশ্যে। সেই জাহাজেই তাঁর হাতে পড়েছিল "চার্লস লা এল" এর লেখা "ভূতত্ত্বের মূলনীতি" নামে একখানি পুস্তক। পুস্তকখানি পাঠ করে ডারউইন সেই প্রথম জানলেন, পৃথিবী কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে এবং কিভাবে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করেছে তার বর্তমান পরিবেশ।

বইটি ডারউইনের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেই থেকে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে তিনি চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করেন। চিরাচরিত ধারণার মূলে কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক হলো তাঁর। ভাবতে ভাবতে একদিন স্থির করলেন, মানুষ জাতিটা স্বয়ং সৃষ্ট

কিংবা ঈশ্বর সৃষ্ট হতে পারে না। পৃথিবীর বুকে তার আবির্ভাব হয়েছে কোটি কোটি বছরের জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায়।

ডারউইন উক্ত ধারণাকে মনে মনে পোষণ করে ক্ষান্ত হলেন না, আরম্ভ করলেন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষার একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা স্থানে প্রাপ্ত অতীত দিনের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম। ততদিনে নিঃসন্দেহ হলেন তিনি। তারপর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করলেন। পুস্তকখানির নাম "অরিজিন অব স্পেসিস" বা প্রজাতির উৎপত্তি।

গ্রন্থটিতে ডারউইন এক নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন। তথ্যটি হল, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও নির্বাচন। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে সব সময় চলছে বাছাই করার কাজ। পৃথিবীতে হরেক রকমের জীবের উদ্ভব হচ্ছে এবং বিলুপ্তিও ঘটছে। প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে জীবকে। যে বা যারা সেই লড়াইতে জয়লাভ করছে, কেবল তারাই টিকে থাকছে। সে লড়াই বেঁচে থাকার জন্য লড়াই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য লড়াই, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডারউইন আরও মন্তব্য করেছিলেন, জীবনযুদ্ধে যারা টিকে থাকে তারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেন না, অপরে যেখানে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে সেখানে কেমন করে টিকে থাকছে? এই বৈশিষ্ট্য, আপন অস্তিত্বকে বজায় রাখার বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এই বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য জীবের আপন বংশধারার মধ্যে সংক্রমিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

ডারউইন আরও উল্লেখ করেছিলেন, পরিবর্তনশীল এই প্রকৃতি। তার দেহে সূচিত হচ্ছে যেমন পরিবর্তন, তেমনই তার বুকে অবস্থানকারী জীব ও উদ্ভিদ দেহেও আসছে পরিবর্তন। চিরকাল ধরে এই পরিবর্তন চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

জীব ও উদ্ভিদ জগতের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাও তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। উক্ত কারণে তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ

করেন এবং সংগ্রহ করেন বহু তথ্য। তারপর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে আরম্ভ করেন গবেষণা। অবশেষে হাতের কাছে বহু সাক্ষ্য প্রমাণাদি মজুত রেখে "প্রজাতির উৎপত্তি" গ্রন্থখানি প্রকাশের সুদীর্ঘ বার বছর পরে প্রকাশ করলেন "মানুষের উদ্ভব" নামক দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ। উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করলেন, অতীতে জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায় পৃথিবীর বুকে এসেছিল বানর জাতীয় এক ধরণের জীব। তারপর সেই বানরেরাও কাল প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে কোন এক উচ্চ শ্রেণীর বানর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে মানুষ।

এখনও পৃথিবীর বহুস্থানে উচ্চ শ্রেণীর বানর জাতীয় প্রাণীকে দেখা যায়। তাদের মধ্যে আফ্রিকার শিম্পাঞ্জী ও গরিলা, মালয় ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গিবন বা উল্লুক, সুমাত্রা-বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের ওরাংওটাং প্রধান। মানুষেঁর সঙ্গে উপরোক্ত চার শ্রেণীর বানরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এদের কারও লেজ নেই, একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকলেও দুপায়ে এরা হাঁটতে পারে, মানুষের মতই তাদের হাতের ও পায়ের আঙ্গুল এবং হাতকেও ব্যবহার করে মানুষের মতই।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গিবন ও ওরাংওটাংদের সঙ্গে মানুষের আরও অনেক মিল আছে। মানুষের মতই ওদের বত্রিশটি করে দাঁত। আয়ুষ্কাল মানুষের মত। মানুষের মত এককালে মাত্র একটি সন্তানের জন্মদান করে। আবার ওদের কঙ্কালটাও পুরোপুরি মানুষের মত।

গরিলা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতিদের যথেষ্ট বুদ্ধিও যে আছে, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। মস্তিষ্ক ওদের যথেষ্ট উন্নত হওয়ায় অতি অল্পেই এরা মানুষকে অনুকরণ করতে পারে। দুঃখ ও শোকে ওরা কাঁদে, আনন্দিত হলে হাসতে থাকে। তাছাড়া খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে ও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে। ডারউইন উপরোক্ত উন্নত শ্রেণীর বানরদের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ বহুকাল ধরে লক্ষ্য করার ফলেই মন্তব্য করেছিলেন, "উন্নতজাতের বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব।"

ডারউইনের কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল, মানুষের পূর্বপুরুষের খোঁজ

করতে গেলেই ঐ গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গিবন ও ওরাংওটাংদের সান্নিধ্যে আসতে হবে। ওদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের অতীত ইতিহাস। হয়ত বা কোন এক সুদূর অতীতে, কোন এক জাতের বানর থেকে কালক্রমে কয়েকটি শাখার উদ্ভব হয়। সেই শাখাগুলির মধ্যে কোন একটি শাখার বিবর্তনের ধারায় মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে অন্যান্য শাখা তেমন পরিপুষ্ট হতে পারেনি। পূর্বের মত থেকে গেছে অথবা কিছু উন্নতি লাভ করেছে।

বলাবাহুল্য, ডারউইনের উপরোক্ত মতবাদ সারা ইউরোপে দারুণ এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ধর্মযাজকেরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর উপরে। তাঁরা অভিযুক্ত করেছিলেন ডারউইনকে। প্রচার করেছিলেন, ডারউইন ধর্মদ্রোহী। তিনি ঈশ্বরের অবমাননা করেছেন, বাইবেলকে অস্বীকার করেছেন।

ধর্মযাজকরা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন. ডারউইনএর মতবাদ ভুল। মানুষের পূর্বপুরুষ কখনও বানর হতে পারে না। বাইবেলে স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। ঈশ্বর স্বীকার করেছেন, জগৎ ও জীব তাঁরই সৃষ্ট। অতএব ডারউইন ঘোরতর নাস্তিক। জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন এবং ঈশ্বরের বাণীকে অবহেলা করেছেন।

চারদিকে সে কি আলোড়ন! তথাপি ডারউইন চুপ করে থাকলেন। মুখ থেকে একটিও প্রতিবাদের ধ্বনি বহির্গত হল না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি জানতেন, বর্তমানে তাঁর এই মতকে সবাই অগ্রাহ্য করলেও একদিন এই মতই জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব অপেক্ষা করে যেতেই হবে তাঁকে।

ডারউইনের সে প্রতীক্ষা কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। মাত্র অল্প কিছুকাল পরেই ইংলণ্ডের টমাস হেনরি হাক্সলে নামে অপর এক জীববিজ্ঞানী ঠিক অনুরূপ সত্যেই একদিন উপনীত হলেন। স্বীকার করে নিলেন ডারউইনের মতবাদকে। কিন্তু ডারউইনের মত চুপ করে থাকলেন না তিনি। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন উক্ত বিষয়ে গবেষণা

করার জন্য। এবার দলে দলে বিজ্ঞানী এগিয়ে এসে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ঘোষিত হল ডারউইনের জয়। অবশেষে পৃথিবীর জনমণ্ডলী গ্রহণ করতে বাধ্য হলো ডারউইনের মতবাদকে।

পরবর্তীকালের উন্নত গবেষণা, এবং আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহুসংখ্যক জীবাশ্ম আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ডারউইনের মতবাদকে। তাই আমরাও আজ ডারউইনের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অবশ্যই উচ্চারণ করবো, "অতীতে উচ্চ শ্রেণীর কোন এক বানর থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে এসেছে মানুষ। ঈশ্বর স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে নিজের মত করে তাকে সৃষ্টি করে নি, কিংবা কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করেননি কেউ। অপর সব রকমের জীবের মত বিশ্বপ্রকৃতিই তার স্রষ্টা।"

বিবর্তনের ধারা

মাটির স্তরগুলি থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে জীবের বিবর্তনের ধারাটি তেমন স্পষ্ট নয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর উপরিভাগে স্তরে স্তরে জমেছে পলি। নদীতে, নিচু জমিতে, হ্রদ ও সাগরের তলদেশে প্রতি বছরই জমে উঠছে পলি। বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে আর গড়ে উঠছে পলির স্তর। যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই পলির স্তরগুলো জমতে জমতে ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠছে। নিচের স্তরগুলোর উপর পড়ছে উপরের স্তরগুলোর প্রচণ্ড চাপ। ফলে স্তর-গুলো শক্ত শিলায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আর পলির স্তরে যে-সব জীবজন্তু এবং গাছপালা আটকা পড়ে যায় সেগুলোও পাথরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

যদিও একই জায়গায় বিভিন্ন যুগের শিলা আবিষ্কৃত হচ্ছে, বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু একই জীবের ক্রমবিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন ছাপ একই জায়গা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ জীবাশ্ম ধারাবাহিকভাবে লাভ করতে না পারলে, জীবাশ্মের ভিত্তিতে কোন একটি বিশেষ প্রাণীর বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা একেবারেই

অসম্ভব ব্যাপার। তাই বিভিন্ন স্থানে একই যুগের একই শিলাস্তর থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্মদের পূর্ববর্তী যুগের জীবাশ্মদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয় বিজ্ঞানীদের। তারপর ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন?এবং তখনই বিবর্তনের প্রকৃত রূপটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। পৃথিবীর নানাস্থানে একই শিলাস্তর অনুসন্ধানের ফলে আরও একটি লাভ হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি কোন্ যুগে কোন্ কোন্ প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল।

এ যাবৎ বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রাণীর যে সমস্ত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে একমাত্র ঘোড়ার বিবর্তনের ধারাটাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এত সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে অন্য জীবের বিবর্তনকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, প্রয়োজনীয় জীবাশ্ম আজও বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয় নি। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঘোড়ার ক্ষেত্রে যখন বিবর্তনবাদ প্রযোজ্য তখন অপরাপর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ঘোড়ার বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল এওসিন যুগের প্রারম্ভে, প্রায় সাত কোটি বছর আগে। অথচ বর্তমান ঘোড়ার যে রূপ, সেটি সে লাভ করেছে আজ থেকে মাত্র এক কোটি বছর পূর্বে প্লিস্টোসিন যুগে। বিজ্ঞানীদের উক্ত সমীক্ষা প্রমাণ করছে, যেকোন জীবের বিবর্তনের ইতিহাস কত সুদীর্ঘ!

ঘোড়ার পূর্বপুরুষের বিজ্ঞানীরা নাম রেখেছেন ইওহিপ্পাস। তখন এর উচ্চতা ছিল মাত্র এগার ইঞ্চির মত। তখন সে পায়ের পাতার উপর ভর করে দৌড়াতো। সামনের পা দুটির প্রত্যেকটিতে চারটি করে এবং পেছনের পা দুটির প্রত্যেকটিতে তিনটি করে আঙ্গুল ছিল। পরবর্তী ওলিগোসিন যুগে তার আকৃতি বেড়ে উঠে। অনেকটা আজকের দিনে শেয়ালের আকার প্রাপ্ত হয়। তখনও তার ছিল থাবা। অবশেষে প্রায় ছ'কোটি বছরের ব্যবধানে সে রূপান্তরিত হয়েছে অঙ্গুলিবিহীন ও যুক্ত-ক্ষুর বিশিষ্ট অতি সুন্দর পশু ঘোড়ায়।

এওসিন থেকে প্লিস্টোসিন পর্যন্ত সব যুগের ঘোড়ার বহু জীবাশ্ম

পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ঘোড়ার পূর্বপুরুষ থেকে যে সব জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই নামকরণ করা হয়েছে। এওসিন যুগের পাওয়া গেছে তিন রকমের জীবাশ্ম ইওহিপ্পাস, অরোহিপ্পাস ও এপিহিপ্পাস। ওলিগোসিন যুগে প্রাপ্ত দুরকমের জীবাশ্মের নাম যথাক্রমে মেসোহিপ্পাস, মায়োহিপ্পাস। মিওসিন যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তিন ধরণের প্যারাহিপ্পাস, মেরীহিপ্পাস ও প্রোটোহিপ্পাস। প্লিওসিন যুগের তিন ধরণের নাম প্লাওহিপ্পাস, প্লেসিহিপ্পাস ও ইকুয়াস। প্লিস্টোসিন যুগেরও নাম ইকুয়াস, যা বর্তমান ঘোড়ার পূর্ব নাম।

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়ে বিবর্তিত ঘোড়ার এত অধিক সংখ্যক জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যে, তা থেকে ঘোড়ার বিবর্তনের ধারাটিকে কল্পনা করতে আদৌ অসুবিধা হয় না। ঘোড়া ছাড়া হাতী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীরও বেশ কিছু সংখ্যক ধারাবাহিক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ওদেরও প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তনের রূপটি অনেকটা স্পষ্ট। কিন্তু মানুষের বেলায় বিভিন্ন সময়ের এমন ধারাবাহিক জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি। মাত্র কয়েকটির গঠনকে ভিত্তি করে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটাকে ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

বিবর্তনের ফলে মানুষ যে এসেছে এ বিষয়ে সন্দেহ কারও নেই। তবে সরাসরি বানরজাতীয় জীব থেকে ওর আগমন কিনা, সে কথা সঠিক ভাবে বলা যায় না। কেবলমাত্র এইটুকুই বলতে পারা যায় যে, মানুষের পূর্বপুরুষ এবং বানর জাতীয় প্রাণীরা একই সাধারণ উৎস থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

ডারউইনের সময় পর্যন্ত কোথাও কেউ কোন আদি মানবের জীবাশ্ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। সত্য কথা বলতে কি, ডারউইন কতকগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক কাল্পনিক মতবাদ খাড়া করেছিলেন। বানর ও মানুষের মধ্যবর্তী সময়ের বিবর্তনের স্তরগুলির কথাও উল্লেখ করেননি তিনি। তবু অদ্ভুত প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী যা কল্পনা করেছিলেন তার অনেকটাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

ডারউইনের মৃত্যুর প্রায় ৯ বছর পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম

আবিষ্কৃত হয় আদিমানবের জীবাশ্ম। পণ্ডিতেরা উক্ত মানুষের নামকরণ করেছেন পিথেকানথ্রোপাস। অতঃপর আবিষ্কৃত হয়েছে ড্রায়োপিথেকাস, অষ্ট্রালোপিথেকাস, সিনানথ্রোপ, হাইডেল বার্গ প্রভৃতি মানুষের জীবাশ্ম। অনুসন্ধান পর্ব এখনও শেষ হয়নি। তবে যা পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে, তা থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলির কল্পনা করে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তবে প্রাণীতত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্তন্যপায়ীদের একেবারে শেষ পর্বে এসেছে মানুষ—বিবর্তনেরও শেষ ধাপে।

মানুষের পূর্বপুরুষ

আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগেকার কথা। পঞ্চম ও শেষ মহাযুগের মধ্যবর্তী সময়। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোথাও কোথাও সৃষ্টি হয়েছিল ঘন অরণ্যানী। সেই অরণ্যের বৃক্ষসমূহ ছিল আজকের তুলনায় অনেক উঁচু। লতাগুলোও ছিল বেশ মোটা ও শক্ত। তখন গাছের মগডাল-গুলোতে লাফাতো একজাতের বনমানুষ। মাটিতে নামতো না বড় একটা। গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো, লতায় দোল খেতো আর কিচির মিচির শব্দ করতো। ওরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই থাকতো, শরীরটাও ছিল লোমশ। দুপায়ে ভর করে দাঁড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। হাত ও পায়ের ব্যবহার প্রায় একই রকমের ছিল। দৈহিক গঠনও তাদের এমন ছিল যে, গাছের ডালেই অক্লেশে নিদ্রা যেতে পারতো। পণ্ডিতদের মতে ওরা ছিল গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির পূর্বপুরুষ।

বিজ্ঞানীদের কল্পিত উপরোক্ত বনমানুষের কোন জীবাশ্ম আজও পাওয়া যায় নি, তবে ওদেরই সমতুল অথবা একটু উচ্চ স্তরের বানরাকৃতি মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন জায়গা থেকে। এদের নাম রাখা হয়েছে ড্রায়োপিথেকাস। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মিওসিন ও প্লিওসিন যুগে ওরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতো। ওদের চেহারাটা শিম্পাঞ্জীর মত হলেও পায়ের গঠনটা দ্বিপদী মানুষের ন্যায়। পূর্ব আফ্রিকার নিবিড় বনে ওরা গাছের মগডালগুলিতে

বিচরণ করতো, কখনও নিকটস্থ তৃণভূমিতেও এক আধবার চক্কর দিয়ে আসতো। কারও কারও মতে কেবল আফ্রিকা নয়, দক্ষিণ ইওরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বনাঞ্চলগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এরা। প্রাণিতত্ত্ববিদদের আরও ধারণা, গ্রীষ্মমণ্ডলের বনভূমিতে পারাপিথিকিনে নামে আরও এক জাতের উন্নত বনমানুষ বাস করতো। ওদেরই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল ড্রায়োপিথেকাসরা। আজকের দিনের গিবন, ওরাংওটাং প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বানরদেরই সমপর্যায়ভুক্ত ছিল ওরা।

ড্রায়োপিথেকাসের পর অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে মানুষকে। সব স্তরের জীবাশ্ম এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। মাত্র কয়েকটি স্তরের জীবাশ্মই লাভ করা গেছে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে ধরা হয় পিথেক্যানথ্রোপাস নামক একজাতীয় বনমানুষের জীবাশ্মকে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ডুবে যাভার পূর্বদিকে ত্রিনিল অঞ্চলের সোলা নদীর গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন এক ধরণের বানরজাতীয় জীবের কয়েকটা দাঁত, উরুর হাড় ও মাথার খুলি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডুবে ঘোষণা করেন, এগুলি আদিমানবের দাঁত ও মাথার খুলি।

ডুবের ঘোষণা চারদিকে একটা বড় রকমের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সেদিন। ডুবের মতকে যাচাই করতে এগিয়েও এসেছিলেন বহু ভূতত্ত্ববিদ। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছিল। শেষে সবাই সমর্থন করেছিলেন ডুবের মতকে। সেই প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল, উক্ত অর্ধ-নর ও অর্ধ-বানরাকৃতি জীবই মানুষের পূর্বপুরুষ। মাথার করোটিই প্রমাণ করেছিল, এরা খাঁটি বানর ছিল না। শিম্পাঞ্জী এবং গিবনের করোটির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের থেকে পৃথক এবং ভিন্ন এক জাতের। কেবল দেখা গেল, আন্দামান ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের করোটির সঙ্গেই রয়েছে বেশি মিল। অথচ মানুষ এরা নয়, গরিলা, শিম্পাঞ্জীও নয়। উভয়ের যেন মাঝামাঝি।

ওদের চেহারারও একটা বর্ণনা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ওদের মুখটা নিচের দিকে বেশ কিছুটা ঝুলে থাকতো। কপালটা ছিল খুব ছোট।

গভীর গর্তে থাকতো চোখ এবং চোয়ালটা বেরিয়ে থাকতো সামনে। যে কোন বনমানুষ থেকে এরা ছিল উন্নত।

যাভায় আবিষ্কৃত আদিমানবের ঐ জীবাশ্ম থেকে মানুষের ক্রম-বিবর্তনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আরও কয়েকটি জীবাশ্মের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, সমুদয় অনুন্নত মানব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল কোন একটি মূল শাখা থেকে। পরবর্তীকালে তারা মাদাগাস্কার থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়াতো। তখন ভারতবর্ষ, মাদাগাস্কার, আফ্রিকা প্রভৃতির মধ্যে কোন জলের ব্যবধান ছিল না। শেষ তুষার যুগ তখনও আরম্ভ হয় নি। অর্থাৎ দেড় থেকে দু কোটি বছরেরও আগের কথা। তুষার যুগের সময় হয়ত কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অখণ্ড ভূভাগ বিছিন্ন হয়ে পড়েছে।

পরের দিকে পিথেক্যানথ্রোপাসদের হাড়, মাথার খুলি প্রভৃতি আরও বহু জায়গায় পাওয়া গেছে। তাছাড়াও পাওয়া গেছে পরবর্তী স্তরের কিছু কিছু জীবাশ্ম। সেইগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে বিবর্তনের ফলে আরও এক শ্রেণীর উন্নত বনমানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এরা রামপিথেকাস মানুষ। ভারতের শিবালিক পর্বতমালার কাছে ওদের হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে। রামপিথেকাসদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ওরা বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো, কপাল ছিল এবং চোয়াল ততটা উঁচু ছিল না। পরের দিকে ওদের হাত-পায়ের গড়ন মজবুত হতে থাকে। পরিশেষে ঐ রামপিথেকাসদের মধ্যে পরিবর্তন হতে হতে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে ওরা হাতে লাঠি ও পাথর ধরতে শেখে। অনেকের বিশ্বাস, পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ এরাই।

রামপিথেকাসের পরবর্তী স্তরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে চীনের পিকিংএর কাছে চৌ-কৌ-তিয়েন নামে একটি গিরি গুহায়। এদেরও ঠিক ঠিক মানুষ বলা যায় না। অপরদিকে বনমানুষও এরা নয়। বিজ্ঞানীরা এদের নামকরণ করেছেন সিনানথ্রোপাস মানুষ।

রামপিথেকাসদের চেয়ে কিছুটা উন্নত। অনেকের মতে ওরা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো এবং আগুনেরও ব্যবহার জানতো। ওদেরই বিজ্ঞানীরা স্থান দিয়ে থাকেন পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। গুহায় এরা বাস করতো। তাই সিনানথ্রোপাসদের গুহামানবও বলা যেতে পারে। অতএব কোটি কোটি বছর অরণ্যে ঘোরাফেরার পর মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে মানুষ গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

এর পরবর্তী স্তরগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। শুরু হয় তুষার যুগ। চলতে থাকে ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা। পুরাতনের অপসারণ ও নতুনের উদ্ভব। লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে সেদিনের মানুষের রূপটাই পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যে সব জীবাশ্ম হাতে এসেছে, তাদের সঙ্গে মানুষের কোন প্রভেদ নেই। ঐ সব জীবাশ্মকে পণ্ডিতেরা মাত্র ২৫ হাজার বছর আগে স্থান দিতে চান। তখন তারা হয়ত পশুপালন করতে শিখে গেছে, অঙ্গ আচ্ছাদিত করেছে, ছবি আঁকতে পেরেছে আর ব্যবহার করতে শিখে গেছে পাথরের শক্ত ও মজবুত হাতিয়ার। বিজ্ঞানীদের ভাষায় ওরা নিয়ানডার্থাল মানুষ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের সমগোত্রীয়। এরা ঘর বানিয়ে বাস করতো, মাছ ধরতো, গাছের গুঁড়িকে পুড়িয়ে নৌকার মত করতো, দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো, বনের ফলমূলও সংগ্রহ করতো। তবে পর্বতের গুহাকে তখনও পরিত্যাগ করেনি।

মানুষ দাঁড়াতে শিখলো ও হাতের ব্যবহার শিখলো

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন আসে, আদিতে মানুষের পূর্বপুরুষ গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো। হাতের ও পায়ের প্রভেদ বড় একটা ছিল না, হাঁটতো আজকের দিনের বানর কিংবা হনুমানের মত চার পায়ে। তাহলে কেমন করে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো আর কেমন করেই বা হাতে ও পায়ের মধ্যে পার্থক্য এলো ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, বানর জাতীয় জীব থেকে মানুষে উত্তরণের মূলে আছে হাতের ব্যবহার এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে। আগে ওরা গাছে গাছে লাফাতো

বটে, তবে ওদের হাতের কাজ ছিল পা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গাছের পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার সময় তারা হাতেরই ব্যবহার করতো, আবার অনেক সময় উঁচু ডাল থেকে পাতা ছিঁড়তে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও হতো। অপরদিকে শ্রম করার স্পৃহাও তাদের হাত ও পায়ের গড়নকে পরিবর্তিত করেছিল।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, একমাত্র শ্রম করতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এমন অভাবনীয় উন্নতি। শ্রমের গুণেই সমস্ত শ্রেণীর জীবের মধ্যে কেবলমাত্র সেই-ই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

উক্ত শ্রম করতে তাকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল স্বয়ং প্রকৃতি। আত্মরক্ষা ও আহার-অন্বেষণ—এই দুটিই ছিল শ্রমের মূল কারণ। শ্রমের স্পৃহা জাগায় এবং আহার অন্বেষণের নানা কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে কালক্রমে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রসার হলো। তখনই পৃথক হয়ে পড়লো অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীদের কাছ থেকে। ফলে অন্যান্য প্রাণীর বংশ যখন পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চললো তখন মানুষ বংশ-বিস্তার করে চললো অপ্রতিহত গতিতে। আর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সে বদল করেছিল তার জীবনযাত্রা প্রণালীকে।

প্লিওসিন যুগের শেষে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো অতি দ্রুত গতিতে। পূর্বের মনোরম পরিবেশ লুপ্ত হলো। একটানা শুষ্ক হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে পূর্বের আকাশ ছোঁয়া গহন অরণ্যানীও হারিয়ে গেল। পরিবর্তে সৃষ্টি হলো আজকের মত ছোট ছোট বৃক্ষপূর্ণ অরণ্য ও তৃণভূমি। অধিকাংশ অতিকায় ও ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর ঘটলো বিলোপ। নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেল সেই বানররূপী মানুষের।

অপরদিকে মানুষের পূর্বপুরুষ তথা সেই উচ্চ শ্রেণীর বানরদের আবাসভূমি—ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশের বিশাল অরণ্যানী আর আগের মত রইলো না। তখন গাছ থেকে বাধ্য হয়ে নামতে হলো তাদের। ড্রাইওপিথেকাস মানুষের যুগ সেটি। তারা গাছের ডালে রাত্রি যাপন করতে থাকলো বটে, কিন্তু দিনের বেলায় মাটিতে নেমে আসতো এবং আহারের অনুসন্ধান করতো। তবে সে সময় সব জাতীয় বানর যে

মাটিতে নেমে এসেছিল—এমন নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে যারা বাস করতো তাদের প্রয়োজনই হলো না ভূমিতে অবতরণ করতে। তাই দৈহিক গঠনও তাদের পরিবর্তিত হলো না। আগের মত বৃক্ষ শাখায় বিচরণ করার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকলো।

এদিকে ড্রাইওপিথেকাসরা মাটিতে বিচরণ করতে আরম্ভ করায় মাটিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হতে হলো। সম্ভবতঃ তৃণভূমির কাছে পিঠে কোন বলিষ্ঠ শত্রু আছে কিনা খোঁজ করার জন্য দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য মাটি থেকে মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাতে হলো। হয়তো প্রথমে তারা বড় বড় তৃণকে অবলম্বন করেই দাঁড়াতে পেরেছিল এবং সেই তৃণ ধরে ধরে দু চার পা এগিয়েও যেতো—যেমন ছোট ছেলেরা দেওয়াল ধরে পায়ে পায়ে হাঁটে। প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে শিশু যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং পতন সত্ত্বেও বার বার দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তেমনই সেদিন ড্রাইওপিথেকাসরাও চেষ্টা করেছিল এবং আনন্দ লাভও করেছিল। তার ফল কিন্তু হলো সুদূরপ্রসারী। লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেহে এলো নানা পরিবর্তন। আর তখনই পৃথক হয়ে পড়লো অপরাপর শ্রেণীর বানর থেকে।

পায়ে ভর করে চলার অভ্যাস গড়ে ওঠায় সম্মুখের প্রত্যঙ্গ দুটি চলার কাজে ব্যবহৃত না হওয়ায় মুক্তি লাভ করলো। কিন্তু অব্যবহার্য অবস্থায় থাকলো না। খাদ্যগ্রহণের কাজেই ব্যবহৃত হলো। এবার সহজ হলো গাছের ফল ও পাতা সংগ্রহ করতে। পরের দিকে হাত দিয়ে ছোট ছোট পশু ও পাখী ধরতে সুবিধা হলো। সুবিধা হলো ভিজে মাটি থেকে ছোট ছোট উদ্ভিদকে টেনে তুলে মূল সংগ্রহ করতে।

আরও লক্ষ লক্ষ বছর পরের ঘটনা। ধীরে ধীরে পা দুটি শক্ত ও মজবুত হয়ে উঠলো, শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলো। হাতের গঠনও তখন মজবুত হয়ে উঠেছে। গাছের ডালপালা ভেঙ্গে লাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে শিখলো আর শিখলো নুড়িপাথর কুড়িয়ে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করতে। এতদিনে সহজ হলো আত্মরক্ষা এবং পশুশিকার দুই-ই।

অবশ্য এ সবের মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার মস্তিষ্ক। মাটিতে নেমে আসার পরেই তাকে তার নিজের জন্য অনেক মেহনত করতে হয়েছিল। আহার অন্বেষণ করতে হয়েছে, শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, সন্তানকেও প্রতিপালন করতে হয়েছে। এইসব করতে গিয়েই তার মস্তিষ্কের হয়েছিল উন্নতি। দাঁড়াতে গিয়ে আদি মানবের বিবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। মস্তিষ্কের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করোটির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুখ অনুভব করেছিল।

৩। হাত ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল।

৪। দ্বিপদী হওয়ার জন্য পেশী ও কঙ্কাল ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল।

৫। বিশিষ্ট সুপ্রা অরবিটাল শিরার ক্রমবিলুপ্তি ঘটেছিল।

৬। দুটি ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে স্বরযন্ত্র থেকে স্বর সৃষ্টি হতে পেরেছিল এবং স্বর সৃষ্টি করতে ঠোঁট ও জিভকে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

৭। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার জন্য মুখমণ্ডলেরও হয়েছিল পরিবর্তন। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ চিবুকের ক্রম-আবির্ভাব এবং উন্নত চোয়ালের অবনতি।

আদি মানবের অন্যান্য দৈহিক পরির্তন

আগেই বলা হয়েছে, সুদূর অতীতে মানুষের পূর্বপুরুষ দুপায়ে ভর করে হাঁটার কৌশল আয়ত্ত করায় সে অন্যান্য সমগোত্রীয় জীব থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই যে পরিবর্তন, সেটি দু দশ পুরুষে আসেনি। অতিক্রান্ত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ পুরুষ। অর্থাৎ এই পরিবর্তন এসেছিল অত্যন্ত ধীর ও মন্থর গতিতে। আগে ওদের বেশির-ভাগ অঙ্গ ছিল অনেকটা অসাড়। ছোট শিশুদের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারবো। পরে দুপায়ে ভর দেওয়ায় এবং অঙ্গ সঞ্চালনের

ফলে সেগুলি ধীরে ধীরে কর্মক্ষম হতে থাকে এবং পরিবর্তন হতে থাকে মুখ, পেশী ও হাত পায়ের আঙ্গুল। তবে বিজ্ঞানীদের মতে মানুষকে কর্মক্ষম করার পেছনে যে প্রত্যঙ্গটি পরিবর্তিত হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেটি তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল।

প্রথমে আজকের মানুষের মত সেদিনের ড্রাইওপিথেকাসদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল ছিল না। সেদিন তাদের বুড়ো আঙ্গুলটা ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু বাঁচার জন্য মানুষকে দীর্ঘকাল বহু মেহনত করতে হয়েছে। কত রকমের কাজ করতে হয়েছিল সেদিন! আর কাজ করতে যেতেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বুড়ো আঙ্গুলের। যেদিন গাছের ডালপালা ভাঙ্গতে শিখলো, যেদিন পাথরের নুড়ি ধরতে শিখলো, সেদিন বুড়ো আঙ্গুলের প্রয়োজন হয়ে পড়লো নানা দিক থেকে। তখন বাধ্য হয়ে পরিবর্তিত হলো বুড়ো আঙ্গুল। লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে অনেকটা হলো সহজ।

অপরদিকে হাঁটতে গিয়ে পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলেরও পরিবর্তন ঘটলো। ব্যাপারটা আজকের দিনে বানর কিংবা শিম্পাঞ্জীদের দেখলে বেশ ভালভাবেই বুঝা যাবে। ওরা মানুষের মত গাছের ডাল অথবা লাঠি ধরতে পারে ঠিকই কিন্তু মানুষের মত লাঠি ধরতে ততটা পটু নয়। কারণ, ঐ হাতের বুড়ো আঙ্গুল। অপর দিকে বানর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতিকে ডালে ডালে চলাফেরা করতে হয় এবং দেহের ভার-সাম্যকে ঠিক রাখতে পায়ের সাহায্যও গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ গাছের ডালকে আঁকড়ে থাকতে হয়। তাই মানুষের মত তাদের কারও পায়ের পাতা নয়। তাছাড়া ঐ ডালকে আঁকড়ে ধরার জন্যই পায়ের আঙ্গুল বেশ বড় এবং একই কাজে হাত ও পা-কে ব্যবহার করতে হয় বলে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে বিশেষ তফাতও নেই। অথচ হাত ও পায়ের গড়ন এক নয়। যদি উভয়ের ব্যবহার আলাদা হতো, তাহলে কালক্রমে হাত ও পায়ের আঙ্গুলে অবশ্যই পরিবর্তন আসতো।

গরিলারা অনেকটা মানুষের মত আচরণ করে। প্রয়োজন হলে দুপায়ে ভর দিয়ে ওরা দাঁড়াতেও পারে। কিন্তু অন্যান্য সময় চলতে

গিয়ে তারা চার হাত পায়ের ব্যবহার করে। অর্থাৎ বানর কিংবা হনুমানের মতও হাঁটে। ওরা বিশালদেহী, ঘন লোমে ঢাকা শরীর, সব রকমের বানরের চেয়ে লম্বা, উচ্চতায় প্রায় মানুষের মত কিংবা মানুষ অপেক্ষা কিছুটা বড়। ওরা এখনও আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের ঘন বনভূমিতে বাস করে। তবে মাটিতে নেমে ঘুরে বেড়াতে ওদের বেশ পছন্দ। চলার সময় কখনও দুপায়ে আবার কখনও দুহাত এবং দুপায়ের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু কাউকে আক্রমণ করতে গেলে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় এবং এই অবস্থায় আক্রমণ চালায়। তাই তাদের পায়ের পাতা অরণ্যচারী অন্যান্য বানর থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। গরিলারা গাছের ডাল ধরতেও যথেষ্ট অভ্যস্ত। অতএব বুড়ো আঙ্গুলের গড়নও বানরদের মত নয়। পায়ের পাতা এবং হাতের বুড়ো আঙ্গুল অনেকটা মানুষের কাছাকাছি।

উক্ত কারণে বলা যেতে পারে, এক সময় গরিলাদের পূর্ব পুরুষও আদি মানবদের মত দ্বিপদী হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও তারা হাত ও পায়ের ব্যবহার একেবারে স্বতন্ত্র করে উঠতে পারেনি। তার কারণ বোধ হয় তাদের ঐ মাথাটা। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, গরিলাদের মাথাটা দেহের অনুপাতে অনেক ছোট। মগজ ওদের মানুষের মত হতে পারেনি। এমনও হতে পারে, মানুষের মত ওরা মেহনত করতে শেখেনি এবং পূর্ব পরিবেশকে আঁকড়ে পড়ে আছে অথচ নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কোন চেষ্টা করেনি। তাই বিশেষ বিবর্তনও আসেনি ওদের মধ্যে।

আদিতে মানুষের হাত-পায়ের গড়নও ওদের মতই ছিল। হাতের আঙ্গুল বড়ই থেকে গেছে, কারণ হাত দিয়ে কাজ করতে হয় তাকে। কিন্তু পায়ের আঙ্গুল দিয়ে বানরদের মত গাছের ডালপালা জড়িয়ে ধরে পতন থেকে রক্ষা করতে হয় না। তাই পায়ের আঙ্গুল লক্ষ লক্ষ পুরুষের ব্যবধানে ছোট হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে গেছে। অপর দিকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, ছুটোছুটি করা ইত্যাদির জন্য পায়ের পাতা যথেষ্ট চওড়া হয়ে উঠেছে। ফলে সহজ হয়ে উঠেছে দেহের ভারসাম্য

বজায় রাখা।

সোজা হয়ে চলাফেরা করাতে অভ্যস্ত হওয়ায় লাভও হয়েছে অনেক। ঐ কারণেই তাদের স্বরতন্ত্রী হয়েছে সহজ ও সাবলীল। চতুষ্পদ জন্তুর মত গলার স্বর কিংবা গরু, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির মত একটি বিশিষ্ট স্বরকে ধরে বসে রইল না। উক্ত কারণে পরের দিকে সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন স্বরের মাধ্যমে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে। যদি সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারতো তাহলে কিছুতেই এমনটি হতে পারতো না।

দ্বিতীয়তঃ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে চোখ এবং দৃষ্টিশক্তিও পরিবর্তিত হয়। দুচোখের সম্মিলিত দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত যেমন প্রসারিত হলো, তেমনই ঘাড় ভেঙ্গে উপরের দিকেও তাকাতে পারলো এবং অতি অল্পায়াসে ঘাড়টাকে এদিক ওদিক করে নিজের চারপাশটাও সহজে দেখে নিতে সমর্থ হলো। তাই একদিকে তার আত্মরক্ষা করতে যেমন সুবিধা হলো তেমনই সুবিধা হলো শিকার করতে। তদুপরি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল আর সহজেই খুঁজে পেয়েছিল খাদ্যবস্তু এবং শত্রুর উপস্থিতি। ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করার স্পৃহা এবং শত্রুর চোখকে ধুলো দেওয়ার মাধ্যমেই বুদ্ধিবৃত্তির হলো প্রসার। মস্তিষ্ক হলো উন্নত। আর মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাশীল হয়ে উঠলো সে।

বিজ্ঞানীরা একটা হিসেবও দাখিল করেছেন। আজ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে যে সব বানর সদৃশ মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মস্তিষ্কের পরিমাপ ছিল ৪৮০ মিলিমিটার। পূর্বের বনমানুষের চেয়ে অনেকখানি বড় এবং আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় বেশ ছোট—প্রায় এক তৃতীয়াংশের মত। আবার ঐ ৫০ লক্ষ বছর আগেকার মানুষদের কাঁচা মাংস খেতে হতো বলে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ওদের চোয়াল ছিল বেশ শক্ত এবং সামনের দিকে কিছুটা বেরিয়ে পড়েছিল। হাত দুটি আজকের মত এতখানি মজবুত ছিল না। কেবল শিকার করা পশু কিংবা পাথরের নুড়িকে বহন করার ক্ষমতা রাখতো।

চোখেরও উন্নতি হলো। আগের কোটরাগত গোল গোল চোখ ধীরে ধীরে ভাসা ভাসা হয়ে উঠলো।

সর্বপ্রথম কোথায় উদ্ভব হয়েছিল মানুষের?

সাম্প্রতিককালের ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মহাসমুদ্রে আত্মগোপনকারী মহাদেশগুলিতে তো বটেই ছোট ছোট দ্বীপগুলিতেও আদিবাসীরা বাস করে। যদিও তাদের অনেকের সভ্যতা আদৌ উচ্চস্তরের নয়, তথাপি তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, কেউ কেউ উন্নত শিল্পেও সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল, আবার কেউ কেউ অরণ্যচারী বর্বর ও হিংস্র। তবে সবাই তারা পড়ে আছে সেই প্রস্তর যুগেই। এখন একটি প্রশ্ন, মানুষ যদি কোন উন্নত শ্রেণীর বানর থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে সেই উন্নত শ্রেণীর বানররা কী স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারায় পৃথিবীর সর্বত্র এমন কি সমুদ্রের মাঝখানে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপেও আবির্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিবর্তনের ধারায় ঐ প্রস্তর যুগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল?

পৃথিবীর সর্বত্রই বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এমন ধারণা বিজ্ঞানীরা পোষণ করেন না। বানর জাতীয় জীবরা কালক্রমে নানা প্রজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। তারপর ঐ সব প্রজাতি থেকেও উদ্ভব হয়েছে নানা শ্রেণীর। এইভাবে বিভক্ত হতে হতে কোন একটি প্রজাতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষের পূর্বপুরুষ। তাই তাঁরা মনে করেন, পৃথিবীর যে-খানে যত মানব জাতি আছে তাদের সবাই উৎপন্ন হয়েছে বিশেষ একটি উৎস থেকে। তারপর বংশবিস্তারের ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল নানাস্থানে। সেদিন পৃথিবীর স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন ছিল না। পরবর্তীকালে কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে জলের ব্যবধান। ব্যাপারটা কতদিন আগে ঘটেছিল, তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা যে ঘটেছিল এ বিষয়ে সকলেই একমত। পণ্ডিতেরা বিভিন্ন স্থানের উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং আদিবাসীদের সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ করেই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের চেহারা দেখলে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন

আসে, একই উৎস থেকে যদি মানুষের উৎপত্তি তাহলে চেহারায় এত পার্থক্য কেন? কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ তামাটে, কেন? মুখের আদল বা সবার সমান নয় কেন? অন্যদিকে মাথার চুল, দৈহিক গঠন, নাক, চোখ প্রভৃতিতেও এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের সাদৃশ্য নেই। কেন এমন পার্থক্য?

উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, পরিবেশের জন্যই মানুষের চেহারায় এমন পার্থক্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের গায়ের রঙ অবশ্যই কালো হওয়ার কথা এবং শীতপ্রধান দেশের ফর্সা। পরিবেশের প্রভাবে অনেক কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য। উদ্ভিদ থেকে জীবজন্তু-পশুপাখী সবাই পরিবেশের ক্রীড়নক। মরুভূমির বুকে উদ্ভিদ এবং পার্বত্য প্রদেশের উদ্ভিদ এক হতে পারে না। গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদের সঙ্গে শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদের সঙ্গে কোন মিল নেই। তেমনই পশুপাখীর সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ। তাছাড়া পরিবেশের গুণেও সবার প্রকৃতি সমান নয়। খাদ্যাখাদ্য, চালচলন সবকিছুর জন্যই পরিবেশ দায়ী।

যাই হোক পণ্ডিতদের সুচিন্তিত মতামত থেকে আমরা বুঝতে পারছি, সমগ্র মানব জাতি একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কথাটিকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে বলা যায় যে, পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু ও গাছপালার উৎস এক—সেই কোন্ আদিম যুগে উদ্ভূত পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন প্রাণপঙ্ক। যা নাকি প্রথম সঞ্চিত হয়েছিল সমুদ্র ও হ্রদের তলদেশে।

পণ্ডিতেরা আরও বলেছেন, আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। তারপর বহু কোটি বছর পরে সৃষ্টি হলো স্থলভাগের। সেই স্থলভাগে জীব আসতেও লেগেছিল কয়েক কোটি বছর। উভচর থেকে স্থলচরের উৎপত্তি। বিবর্তনের ধারায় একদিন এলো স্তন্যপায়ীরা। পরিশেষে স্তন্যপায়ীদের শেষ ধাপে মানুষ। সেই মানুষ আবার বিবর্তনের পথে স্থলভাগের সর্বত্র একই সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়নি। কোন একটি বিশেষ উৎস থেকে এবং কোন একটি বিশেষ জায়গায় আবির্ভূত হয়। তারপর ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে। এখন প্রশ্ন, পৃথিবীর কোন স্থানে তারা আবির্ভূত হয়েছিল?

প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম বহু স্থানেই আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরোপ ভূখণ্ডের নানা স্থানে, চীনে, ভারতে, আফ্রিকায়, যাভায়, বর্মায়, কত জায়গায়! জীবাশ্মগুলিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ভূ-তত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানীরা। মোটামুটি একটা বয়সও নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত স্থানগুলিতে প্রাপ্ত জীবাশ্মসমূহের বেশির-ভাগকে তারা পঁচিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের আগে স্থান দিতে চান না। কেবলমাত্র মধ্য এশিয়ার দু-একটি স্থানে যে জীবাশ্ম তাঁরা লাভ করেছেন, তাদেরই বয়সটা অনুমান করেছেন পঞ্চাশ লক্ষ বছরেরও পূর্ববর্তী। ওদের ঠিক মানুষ বলা যায় না। অর্ধনর ও অর্ধবানরাকৃতি। এদের থেকে আর একটু উন্নত ধরনের মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে (ড্রাইওপিথেকাসদের কঙ্কাল) ইওরোপ, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে ও ভারতে। তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন মধ্য এশিয়ার কোন একটি স্থানেই বিবর্তনের ধারায় প্রথম এসেছিল অর্ধনর ও বানরাকৃতি মানুষ। পরে খাদ্যাভাবের দরুন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল নানাস্থানে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মতে মধ্য এশিয়াই মানুষের পিতৃভূমি। অনেক পরে, পুরাতন প্রস্তর যুগেই পৃথিবীর স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেদিন যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে অবশ্য প্রাণ হারাতে হয়েছিল, তবে টিকেও গিয়েছিল কিছু সংখ্যক। বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে যারা বেঁচে রইলো, তারা আত্মগোপন করলো মহাসমুদ্রের মাঝখানে। সংখ্যালঘু ছিল তারা। উন্নতি হল ব্যাহত। অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখলো অরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর পড়ে রইলো সেই পুরাতন প্রস্তর যুগে।

অপরদিকে যারা পিতৃভূমিতে এবং ইওরোপ. চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করছিল তাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। বংশ বিস্তারের ফলে নানা দল ও উপদলে কালক্রমে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কোন কোন দল উন্নতির দিকে এগিয়ে গেল, আবার কোন কোন দল পুরাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকে অরণ্যেই পড়ে রইল। কালক্রমে উন্নত দলগুলি আরও হলো উন্নত। পরিবর্তন করলো পূর্বের জীবনযাত্রা প্রণালীকে। কিন্তু

অরণ্যের অধিবাসীরা পরিবর্তন করলো না তাদের পুরাতন ব্যবস্থাকে। এদিকে উন্নত জাতিগুলি ক্রমান্বয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করলো। অরণ্যচারীদের জোর করে সরিয়ে দিল, কিংবা ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখলো, ভূষিত করলো অস্পৃশ্য, বর্বর, দস্যু, দানব, দাস প্রভৃতি অভিধায়। অবশ্য এসব ঘটনা অনেক পরবর্তীকালের।

মানুষের ক্রমবিকাশ

মানুষের বিবর্তন পথের দ্বিতীয় স্তরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লিকী সাহেব আফ্রিকার টাঙ্গানাইকার অন্তর্গত ওলডুভাই গিরিখাতে প্রায় ৫ লক্ষ বছরেরও আগে আবির্ভূত মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করতে সমর্থ হওয়ায় মানুষের ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটি অনুমান করতে সমর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। লিকী সাহেব আবিস্কৃত সেই কঙ্কালকে অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষের কঙ্কালরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রস্তরীভূত উক্ত জীবাশ্ম থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন, এরা পর্বতের গুহার মধ্যে বাস করতো, সম্ভবতঃ সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারতো। তাদের মুখটা খাঁটি মানুষের মত না হলেও বনমানুষের মত ছিল না। তবে মুখটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকতো।

পণ্ডিতদের ধারণা, এই অস্ট্রালোপিথেকাসরা পরের দিকে লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে যে রামপিথেকাস মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের কাছ থেকে অন্ততঃপক্ষে চার শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এরা সবাই দুপায়ে ভর করে চলতো, শরীরটা ছিল লোমশ, মুখে ভাষা ছিল না। ওদের সবার মুখ ঝুঁকে থাকতো সামনের দিকে। অস্ট্রালোপিথেকাসরা ছিল তাদের একটি শ্রেণীর অন্তর্গত।

কালক্রমে রামপিথেকাস থেকে উৎপন্ন চার শ্রেণীর মধ্যে অস্ট্রালোপিথেকাসসহ তিনটি শ্রেণী লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চতুর্থ ধারাটিই টিকে ছিল। বিজ্ঞানীরা তাদের নাম রেখেছেন

পিথেকানথ্রোপাস। প্লিস্টোসিন যুগে ঐ ধারাটি থেকে উদ্ভব হয় হোমো-এরেকটাসদের। হোমোএরেকটাসদের আবির্ভাবকাল আজ থেকে চার লক্ষ বছর আগে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ওরা বনমানুষ থেকে উন্নত ছিল। তবে চেহারায় মানুষ অপেক্ষা বনমানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল অধিক। অনেকের মতে দ্বিতীয় তুষার যুগ পর্যন্ত টিকে ছিল এরা। কেউ কেউ আবার এমনও মনে করে থাকেন, এরা আগুন জ্বালাতে পারতো এবং কুম্ভকারের কাজ জানতো।

পিথেকানথ্রোপাস থেকে উদ্ভূত হোমোএরেকটাসদের পরবর্তী স্তর সিনানথ্রোপাস। সিনানথ্রোপাসরা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো এবং আগুন জ্বালাতে পারতো। এরা বনমানুষ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তবে এদেরও মানুষ বলতে অনেকেই নারাজ। পিকিং-এর কাছে এক গিরিগুহা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ওদের জীবাশ্ম। শরীরটা ছিল লোমশ। ভাষাও ব্যবহার করতে পারতো না।

তৃতীয় তুষার যুগের সময়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে বিবর্তনের ধারায় আবির্ভূত হয়েছিল হোমোনিয়ানডার্থালিস নামে একটি বিশেষ প্রজাতি। ওরা সারা ইওরোপে এককালে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদের আবির্ভাবের কয়েকটি স্তরও কল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে পিথেকানথ্রোপাস থেকে টেলানথ্রোপাস, পরের স্তর আটলানথ্রোপাস, তারপর হাইডেলবার্গ মানুষের উৎপত্তি। ঐ হাইডেলবার্গ থেকেই উৎপন্ন হয় হোমোনিয়ানডার্থাল মানুষ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ানডারথাল উপত্যকায় প্রথম ওদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই অনুরূপ নামকরণ।

হোমোনিয়ানডারথাল মানুষের কঙ্কালের গড়ন প্রকৃত মানুষ থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ওরা লম্বায় কিছুটা খাটো ছিল। বলিষ্ঠও ছিল যথেষ্ট কিন্তু ছুটতে বিশেষ পারতো না। মেরুদণ্ডটা বাঁকা হওয়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। অবশ্য আগেকার নানা প্রজাতি অপেক্ষা ওদের বুদ্ধি ছিল বেশি। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ওদের মাথার খুলি ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও নিচু। মস্তিষ্কের

গহ্বর বেশ বিস্তৃত। একমাত্র ওদেরই কঙ্কালে স্পষ্ট ভ্রূর দাগ দেখা গেছে। কিন্তু ওদের ধারাটাও টিকে নেই। শেষ তুষার যুগের আগে লুপ্ত হয়ে গেছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বানর থেকে মানুষের উত্তরণের পথে কোটি কোটি বছরের মধ্যে নানা প্রজাতি ও উপপ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেইসব প্রজাতির অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে। কোন প্রজাতি আবার অন্য প্রজাতিকে হটিয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্যকে জাহির করেছে। কিন্তু সে-ও দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। উন্নত হয়েছে আবার কোন একটি দল। এইভাবে যুগে যুগে কত প্রজাতি এসেছে, প্রবল হয়েছে, আবার কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ রেখে গেছে বংশধারা। তাদের থেকে পুনরায় উৎপন্ন হয়েছে কত প্রজাতি। তাই ড্রাইয়োপিথেকাস থেকে হোমোনিয়ানডারথাল পর্যন্ত ক্রমবিকাশের মাত্র একটি ধারা নয়। নানান ধারার এক-একটি স্তর উপরোক্ত প্রজাতিগুলি। আবার প্রতিটি স্তরের জীবাশ্মও আবিষ্কৃত হয় নি। তাই বহু রহস্য এখনও অজ্ঞাত থেকে গেছে। বিজ্ঞানীরা শুধু এইটুকুই মনে করে থাকেন, শেষ পর্যন্ত যে কয়েকটা প্রজাতি টিকে ছিল তাদের মধ্যে একটি ছিল হোমোস্যাপিয়েনস। কালক্রমে ঐ হোমোস্যাপিয়েনসদের কাছ থেকে উৎপন্ন হয় ক্রোম্যাগনন মানুষ। বর্তমান কালের মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ঐ ক্রোম্যাগনন মানুষেরই। তাই মানুষের প্রকৃত পূর্বপুরুষের পর্যায়ে পড়ে কেবলমাত্র ঐ ক্রোম্যাগননরা। অনেকের মতে ক্রোম্যাগননদের আবির্ভাবের সময় বেশ কিছু নিয়ানডারথাল মানুষও ছিল। ক্রোম্যাগননরা তাদের হটিয়ে দেয় এবং সমগ্র পশ্চিম ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনাটি আজ থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগে ঘটেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। অতএব বলা যায় যে, প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব হয়েছে ঐ পঁচিশ হাজার বছর আগে।

মানুষ কেন এমন উন্নত হলো?

পৃথিবীতে জীব আসার পর থেকে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত

হয়েছে। যুগে যুগে এসেছে কত জীব। তাদের কেউ বা লুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে। কেউবা কোটি কোটি বছর বিবর্তনের ফলে অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। একটা প্রশ্ন, যেসব প্রাচীন জীবের বংশধারাকে পৃথিবী বহন করে আসছে তারা তো কেউ মানুষের মত উন্নত হতে পারে নি! এমন কি বিবর্তনের ধারায় বানরের পর্যায়ে আসতে পারে নি। অন্যদিকে বানররাও এসেছে কোটি কোটি বছর আগে। ওরাও তো সবাই মানুষের পর্যায়ে আসতে পারতো! নিদেন পক্ষে গরিলা বা শিম্পাঞ্জীর মত! কেন হলো না? আর কয়েক লক্ষ বছরের ব্যবধানে কেমন করে মানুষ সবাইকে ছাড়িয়ে গেল?

মানুষের উন্নতির মূলেই আছে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। হাজার হাজার প্রজাতির মধ্যে সেই যে আদি কালের কোন একটি বানরের প্রজাতি বৃক্ষশাখা থেকে নেমে এসে দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিনই খুলে গিয়েছিল তার বুদ্ধির দুয়ারটি। সে এক শুভক্ষণ! যদি মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারতো তাহলে ঐ বানরদের পর্যায়েই সে থেকে যেতো। উন্নতি বড় একটা হতো না তার।

পণ্ডিতদের ধারণা, মানুষ যেদিন দুপায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল সেইদিনই তার দৃষ্টিশক্তিটা অনেক দূরে স্থাপন করতে পেরেছিল এবং দূরত্ব সম্বন্ধে ধীরে ধীরে তার একটা ধারণা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। মানুষের তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে থাকে সেইদিন থেকেই। আর সেইদিন থেকেই তাদের মস্তিষ্কের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। মাত্র কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত জীবকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যায়।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা জানি, আমাদের শরীরের সর্বত্রই রয়েছে স্নায়ুজাল বা নার্ভ সিস্টেম। নার্ভতন্ত্রের সুবৃহৎ এবং সবদিক থেকে সুগঠিত পুরোভাগটিই মস্তিষ্ক। এটি সম্পূর্ণরূপে করোটির মধ্যে অবস্থান করে এবং মস্তিষ্কের নিম্নভাগ সুষুম্নাকাণ্ডে রূপায়িত হয়েছে।

মস্তিষ্কের পুরোভাগে থাকে প্রধান কার্যালয় বা সেরিব্রাম। সেরিব্রাম

দুটো স্বতন্ত্র গোলার্ধে বিভক্ত এবং প্রত্যেক স্নায়ু বন্ধনীর দ্বারা সংযুক্ত। মস্তিষ্কের উপরে আছে অসংখ্য ভাঁজ। সেই ভাঁজগুলি সেরিব্রামকে কতকগুলি "লোব" বা কুণ্ডলীতে ভাগ করেছে। ঐ সকল কুণ্ডলীর কোনটিতে দৃষ্টিকেন্দ্র, কোনটিতে শ্রবণকেন্দ্র, কোনটিতে স্বাদকেন্দ্র এবং চেতনা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি সমস্ত উচ্চবৃত্তিমূলক কেন্দ্র অবস্থিত।

আদিম পৃথিবীতে যখন জীব সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাদের গঠন ছিল অত্যন্ত সরল। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণীদের দৈহিক গঠন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক ছিল না। ওদের দেহ থেকে জটিল মেরুদণ্ডী প্রাণীর যখন আবির্ভাব হলো তখন সংযোজিত হলো মস্তিষ্ক।

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীরই মস্তিষ্ক আছে। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ প্রভৃতির খবর স্নায়ুজালের দ্বারা সংগৃহীত হয়ে মস্তিষ্কের সেরিব্রামে গিয়ে পৌঁছায়। সেরিব্রাম থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত একটি সংযোজক পদার্থ থাকে। তাকে মেরুসন্ধি বলা হয়। উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মেরুদণ্ড থেকে মেরুসন্ধি এবং মেরুসন্ধি থেকে সেরিব্রামের কার্যকারণ সম্পর্কটা বিশেষ উন্নত। যেহেতু ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা সেরিব্রামের আছে তাই সেরিব্রামের পরিপুষ্টি এবং বিস্তারই বুদ্ধি বিকাশের একমাত্র কারণ।

সেরিব্রামসব প্রাণীরই আছে। কিন্তু মানুষের মত এত বিস্তৃত ও পুষ্ট নয়। আদিকালে বানরদের ছিল নিতান্ত কম। তথাপি অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশি থাকায় সবার থেকে সে ছিল বুদ্ধিমান। পরের দিকে বনমানুষদের ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হয়। ফলে তীক্ষ্ণ নখ ও দন্তহীন এবং হীনবল হওয়া সত্ত্বেও বিনা হাতিয়ারে সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কের যে প্রসার হয়েছে, সে কথা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করে ভালভাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন ড্রাইওপিথেকাস, অস্ট্রলোপিথেকাস, পিথেকানথ্রোপাস, নিয়ানডারথাল প্রভৃতিদের সবার মস্তিষ্কের প্রসার

সমান নয়। কিথ্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ওদের প্রত্যেকের খুলির ভেতরে যেখানে মস্তিষ্ক থাকে সেখানকার ছাঁচ গ্রহণ করেছেন এবং ওজনও নির্ণয় করেছেন।

সেরিব্রামের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে। আজকের বুদ্ধিমান মানুষের সেরিব্রামে অনেকগুলো পাক বা কুণ্ডলী দেখা যায়। এই পাক বা কুণ্ডলীর সংখ্যা আগেকার দিনে বনমানুষের মধ্যে খুব কম ছিল। এমনকি আজকের দিনে অর্ধসভ্য এবং প্রায় অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যেও কুণ্ডলীর সংখ্যাল্পতা দেখা যায়। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঐ কুণ্ডলীগুলিই সবকিছুর নিয়ামক।

পরীক্ষা থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের বুদ্ধির বিকাশ এক আধ হাজার বছরে হয়নি। লক্ষ লক্ষ বছরের সাধনার ফলে মানুষ নিজেই অর্জন করেছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, মানুষ ভালভাবে দাঁড়াতে পারার পর থেকেই সেরিব্রামের প্রসার হয়েছে।

বিজ্ঞানী ইলিয়ট স্মিথ একটি বিশেষ সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, চতুষ্পদ প্রাণীরা অধিক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে না পারার জন্য তাদের ঘ্রাণশক্তিটা প্রবল। তাই তাদের মস্তিষ্কে ঘ্রাণ-বোধক অংশেরই প্রাধান্য। তেমনই আদিকালে বানর জাতীয় জীবেরা যখন চারপায়ে ভর করে চলতো, তখন তাদের মস্তিষ্কেও ছিল চতুষ্পদ প্রাণীর মস্তিষ্কের অনুরূপ। যখন দাঁড়াতে শিখলো তখন আহার সংগ্রহের জন্য এবং শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ঘ্রাণ লওয়ার বিশেষ আর প্রয়োজন হল না। ফলে ঘ্রাণবোধক অংশের প্রাধান্য ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। তখন প্রসারিত হলো দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করার অংশের স্থান। ঐ অংশটুকুর যতই ধীরে ধীরে প্রসার ঘটতে লাগলো ততই সূচিত হলো তার জয়যাত্রা।

বিজ্ঞানীরা ছোট-ছোট শিশুর উপমা দিয়েও সত্যটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে থাকেন। অনেকে আবার মানুষের ক্রমবিকাশের স্তরগুলোর সঙ্গেও শিশুর তুলনা করেন। শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় এক টুকরা মাংসপিণ্ডের মত। তখন শরীরের কোন অঙ্গই সুগঠিত নয়। কিছুকাল পরে বুকে

হেঁটে একটু একটু এগুতে চেষ্টা করে, তারপর হামাগুড়ি দেয়, পরিশেষে দুপায়ে হাঁটতে শেখে। ঠিক সেই সময় নিজ দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কখন দেওয়াল ধরে, কখনও বা বড়দের শরীরকে ভর করে।

হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থা পর্যন্ত আদি অ্যামিবা থেকে চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের ধারাটি মনে করা যেতে পারে। শিশু হামাগুড়ি দেয় এবং বসেও। উক্ত অবস্থাকে বানরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শিশু যেমন দুপায়ে হাঁটতে গিয়ে বার বার আছাড় খায়, মানুষেরও প্রথম অবস্থায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আমরা দেখেছি, শিশু হাঁটতে শিখলেই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার হয় এবং ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক সব কিছুর উপর কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ঠিক তেমনই মানুষ দাঁড়াতে শিখতেই ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিল এবং আশেপাশের সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে পড়েছিল।

এবার আমরা অতীতের সেই ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে একটু তাকাতে পারি। কল্পনা করতে পারি সেদিনের মানুষের সম্ভাব্য জীবনযাত্রা প্রণালী। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির খামখেয়ালিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে ওরা কেমন করে টিকতে পেরেছিল? সেই দুর্যোগের দিনে কেমন করে ধরেছিল হাতিয়ার, কেমন করে অঙ্গকে আচ্ছাদিত করেছিল, কেমন করে আগুন জ্বালিয়েছিল আর কেমন করেই বা সমাজ প্রতিষ্ঠা ও চাষবাসে আত্মনিয়োগ করেছিল?

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। স্বদেশের ও বিদেশের বহু বিজ্ঞানী, কবি ও সাহিত্যিক মানুষের সেই ইতিহাসকে অন্ধকারের গর্ভ থেকে উদ্ধার করতে কত পরিশ্রম ও কত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মায়াপূর্ণ দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়েছেন অতীতের দিকে এবং এখনও তাঁদের বিরাম নেই। তাঁরা যে সব তথ্য আহরণ করেছেন তারই একটা চিত্র তুলে ধরা হল।

আদি মানবের জীবনযাত্রা

পুরাতন প্রস্তর যুগের পূর্বে

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগের দিনগুলি। সেদিনের

পৃথিবী আজকের মত এত সুন্দর ছিল না। ছিল না আজকের মত জীবজন্তু ও গাছপালা, ছিল না এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তখন পৃথিবীর পূর্ব পরিবেশটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটানা উষ্ণপ্রবাহের ফলে বিদায় গ্রহণ করেছে পূর্বের আকাশছোঁয়া ঘন অরণ্যানী। যেখানে সেখানে জেগে উঠেছে মরুপ্রায় অঞ্চল। পুরাতন জীব ও উদ্ভিদের পরিবর্তে আসতে আরম্ভ করেছে নতুন আগন্তুক।

শত পরিবর্তন সত্ত্বেও, সহস্র সহস্র বছর ধরে শুষ্ক প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার ফলেও পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অবশ্যই হতো। তাই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে নি সেখানকার গহন অরণ্যানী। প্রকৃতির খেয়ালে আবার সেই নিবিড় বনের মধ্যে কোথা থেকে আমদানী হয়েছিল দ্রাক্ষা জাতীয় লতা ও কাঠ বাদাম জাতীয় গাছ। আর ঠিক সেই সময়ই এসেছিল বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর জাতীয় জীব। গাছে গাছে তারা দোল খেতো, গাছের কচিপাতা-দ্রাক্ষা-কাঠ বাদাম ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতো। হিংস্র জন্তুর ভয়ে তলায় তারা নামতো না। সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতো গাছের ডালে।

তারপর কেটে যায় কত লক্ষ লক্ষ বছর। জীব ও উদ্ভিদ যেহেতু পরিবেশের ক্রীড়নক, তাই পৃথিবীর পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনে সেই বানর জাতীয় জীবরাও নিজেদের ঠিক রাখতে পারলো না। বিভক্ত হয়ে পড়লো কত প্রজাতিতে। প্রজাতিগুলি থেকে আবার উৎপন্ন হলো কত উপপ্রজাতি।

এইভাবে বিভক্ত হতে হতে আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে ওদেরই কোন একটি শাখা বৃক্ষশাখা থেকে অবতরণ করেছিল মাটিতে। আরও কত লক্ষ লক্ষ বছর পরে প্রকৃতির খেয়ালে সেই শাখাটির কোন একটি প্রজাতি চার পায়ের পরিবর্তে দুপায়ে হাঁটার অভ্যাস শুরু করে। অতঃপর বিভক্ত হয়ে পড়ে গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি কত শাখায়!

কালের ভ্রূকুটিকে ওরাও উপেক্ষা করতে পারেনি। ক্রমবিকাশের

নানা স্তর অতিক্রম করে আজ থেকে মাত্র দেড় লক্ষ বছর আগে আত্মপ্রকাশ করে এক উন্নত জীব। তারা দুপায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত ছিল, মেরুদণ্ড ছিল বক্র, চোয়াল ছিল উঁচু, চোখ ছিল কোটরাগত, কপাল ও ভ্রূ ছিল না বললেও চলে। ওরাই আদি মানবের সমপর্যায়ভুক্ত অতি পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ।

এখানে ওখানে অনেক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ওদের। বিশেষ করে কেনডেঙ্গ পাহাড়েয় তলায়, বেঙ্গোয়ানা নদীর গর্ভে পাওয়া গেছে ওদের মাথার খুলি, হাড়, দাঁত প্রভৃতি কত কি! প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ঐ মানুষের নাম রেখেছেন পিথেকানথ্রোপাস মানুষ।

পিথেকানথ্রোপাস মানুষের পরবর্তী স্তরের মানুষ সিনানথ্রোপাস। ওদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে চীনের পিকিং-এর কাছে চৌ কৌ তিয়েন নামে একটি গুহার মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে পিথেকানথ্রোপাস ও সিনানথ্রোপাস উভয়েই ছিল বনমানুষের চেয়ে কিছুটা উন্নত ও বুদ্ধিমান। মুখে ছিল না ভাষা, অঙ্গে ছিল না কোন আবরণ, খাদ্য ছিল কাঁচা মাংস ও ফলমূল। পরবর্তীকালে উদ্ভূত আদি মানবের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। তথাপি ওদেরই কাছ থেকে প্রায় লক্ষ বছরের ব্যবধানে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে আবির্ভূত হয়েছে আজকের মানুষের সমপর্যায়-ভুক্ত মানুষ। সেই হিসাবে ওরাও আমাদের পূর্বপুরুষ। ওদের ইতিহাস আমাদেরই পূর্বপুরুষের ইতিহাস। পর্বতের পাদদেশে কিংবা অরণ্যে আত্মগোপনকারী অসভ্য ও বর্বর বানর জাতীয় জীবের কথা—আমাদেরই অতীত কথা।

কী ভয়ঙ্কর আর কী বীভৎস ছিল অতীতের সেই দিনগুলি! সর্বত্র ওৎ পেতে বসে থাকতো মৃত্যু। হিংস্র জন্তু ও বিষধর সাপের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে হতো। খোলা আকাশের নিচে বন্যপ্রাণীদের মত ঘুরে বেড়াতে হতো, আর এড়িয়ে চলতে হতো তুষারপাত, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরিকে। সেদিন কতজনে যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে, সাপ-শার্দুলের শিকার হয়েছে, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধির কবলে পড়েছে, তার কোন হিসেব নেই।

তবু নিঃশেষ ওরা হয়নি। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে কত প্রাণী সেই আমলে হারিয়ে গেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে। কিন্তু বুদ্ধির জোরে এবং মেহনতের জোরে ওদের বংশধরদের হয়েছে বাড়-বাড়ন্ত। সেদিনের সেই মেহনত বলতে একমাত্র খাদ্যসংগ্রহের মেহনত—যা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে উদরান্নের সংস্থানের জন্য উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হতো, বুকে দুর্বার সাহস নিয়ে কেবল সামনে এগিয়ে যেতে হতো, আপন শক্ত হাত দুটির উপর আস্থা স্থাপন করে হিংস্র জন্তু ও সাপখোপদের সঙ্গে লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হতো। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কোন কিছুই তাদের দৃঢ় মনোবলকে ভাঙ্গতে পারতো না। বেঁচে থাকার জন্য সে কী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা! এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে ঘটেছে তাদের উত্তরণ।

সেদিন ওদের সম্ভাব্য জীবনযাত্রা প্রণালীর এক-আধটু কল্পনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, ভাই, বোন, মা ও বাবাকে নিয়ে ছোট্ট একটি পরিবার। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী থেকে দূরে একটি বড় গর্তের মধ্যে বাস করে ওরা। কাঁটাঝোপ এবং শুকনো পাতা দিয়ে ঢাকা গর্তের মুখ। তলায়ও শুকনো পাতা গাদা করা আছে। শীতে যখন কাঁপুনি ধরে তখন সেই পাতাকে চাপায় গায়ে, গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরমে প্রাণ আইঢাই করে, বৃষ্টির দিনে মাথায় ঝরে টুপটাপ জল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে, হাতে থাকে এক এক টুকরা ভারী পাথরের হাতিয়ার। একটু জিরিয়ে নেওয়া কিংবা অন্যমনস্ক হওয়ার কোন উপায় নেই। কেবল এগিয়ে চলা, এগিয়ে চলা, আর এগিয়ে চলা। বুক সমান উঁচু নল-খাগড়ার মত মোটা মোটা তৃণকে সরিয়ে, এবড়ো খেবড়ো পথে সদর্পে পা ফেলে ফেলে, কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হতে হতে এগিয়ে চলা। আগে পিতা, মাঝে ছেলে মেয়ে দুটি, আর পেছনে মা। সদা সতর্ক চোখ, কান ও নাক। উলঙ্গ সবাই। ঘাসের ধারাল পাতার আঁচড় লেগে লেগে সর্বাঙ্গে ঝরছে রক্তধারা—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই, পাথর ঘষে ঘষে হাত

ক্ষয়ে গেছে—তবু মুষ্টি সুদৃঢ়, চারদিকে হিংস্রজন্তুর ভয়ঙ্কর গর্জন—তবু মুখ ভয়লেশহীন।

চলতে চলতে পিতা দেখলো, সামনে ঘাসগুলোর ডগা হঠাৎ যেন নড়ে উঠলো। অস্ফুটে এক রকম কিচ্ কিচ্ করে শব্দ করে উঠলো। সে শব্দ মুখের ভাষা নয়—কেবল সঙ্কেত। সে সঙ্কেতের অর্থ কেবল ওরাই জানে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে পড়ে।

একটু পরে চোখে পড়ল, একটা সাপ এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে পড়লো সবাই। ভোঁতা পাথর ঠুকে সেটিকে মেরে ফেললো এবং সাপটাকে দিয়ে সকালের জলযোগটা সেরে ফেললো।

আবার এগিয়ে চলা। এক সময় হয়ত দেখতে পেলো বিশাল এক খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র কিংবা বিশালকায় ম্যামথ অরণ্য তোলপাড় করে ছুটে আসছে। কাকা ও বাবা শিশু সন্তান ছটিকে কোলে চেপে আত্মগোপন করলো লম্বা লম্বা তৃণের আড়ালে।

এইভাবে ঘুরলো সারা দিনটা। ঝরনার জল খেলো, গাছের কচি পাতা চিবালো, ভাগ্য ভাল তো এক আধটা খরগোশ জাতীয় প্রাণীকে শিকার করলো। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই ফিরে এল আস্তানায়।

শুধু একটি মাত্র পরিবার ঘুরে বেড়াতো না। এখানে ওখানে তৃণ-ভূমিতে ঘুরে বেড়াতো এমনই কত পরিবার। একটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবারের যদি সাক্ষাৎ হয়ে যেতো তাহলে যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। ছু দলের পিতারাই হুঙ্কার দিয়ে উঠতো, আক্রমণ করতো একে অপরকে। যে জয়লাভ করতো সে জোর করে কেড়ে নিতো অন্যের হাতিয়ার এমন কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে।

সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশে তারা কেমন করে টিকে থাকলো? কেমন করে বিবর্তনের স্তরগুলি অতিক্রম করে রূপান্তরিত হল মানবে?

পণ্ডিতদের বিশ্বাস, উত্তরণের মূলে ছিল তাদের মগজ। আজকের দিনে মনে করা হয়, যেদিন সে বৃক্ষশাখা থেকে অবতরণ করেছিল

সেইদিন থেকে তার মধ্যে সূচিত হয়েছিল নানা পরিবর্তন। লক্ষ লক্ষ বছরের তপস্যায় যেদিন সে দুপায়ে দাঁড়াতে শিখলো সেদিন প্রকৃতি বাধ্য হল এদের কাছে তার অবগুণ্ঠন মোচন করতে এবং সেইদিনই সে পৃথক হয়ে পড়লো অপরাপর সমস্ত প্রাণী থেকে। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত হওয়ায় মস্তিষ্কের হলো আরও উন্নতি। হাত ও পাকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে দেহেও সূচিত হল নানা পরিবর্তন। হাত দিয়ে কোন কিছুকে কুড়াতে শিখলো, ডালপালা ও পাথর ছুঁড়তে শিখলো, অপরকে আঘাত করতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়লো।

সবকিছুর মূলে তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও কাজ করছিল। সে বৈশিষ্ট্য-শ্রমের প্রতি আগ্রহবোধ। ওদের শ্রম অপরাপর জন্তু-জানোয়ারদের মত ছিল না। সেই উষালগ্নেই কেমন করে যেন টের পেয়েছিল, কী তারা চায় এবং কেন শ্রম করে চলেছে? তাই তারা অপরাপর বন্যজন্তুর মত অযথা ঘুরে বেড়াতো না, দৌড়-ঝাঁপ-মারামারি করতো না, ক্ষুধার সময় হিংস্র শার্দুলের মত শুধু গর্জন করতো না বা শুকনো হাড় চিবাতো না, পর্যাপ্ত খাদ্য লাভ করলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করতো না। সমস্যা এলেই তা সমাধানের উপায় চিন্তা করতো। এক কথায় শ্রমের প্রকৃত অর্থ কেমন করে যেন হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিল।

তারা প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করতো না। যেদিন সে দাঁড়াতে শিখেছিল, সেইদিনই সে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। জোর করে আদায় করে নিয়েছিল বুদ্ধি। বুঝি বা তখনই বিশ্ব প্রকৃতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। কেন না বিশ্ব প্রকৃতি তৃণভোজীদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে সৃষ্টি করেছিলেন বিশাল তৃণভূমি, শীত গ্রীষ্ম থেকে রক্ষার জন্য গায়ে লোম, আত্মরক্ষার জন্য শিং, অসুরের মত শক্তি ও ক্ষিপ্রগতি। অপরপক্ষে মাংসাশীদের নিমিত্ত গায়ে লোম, তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখর। ওরাও যখন বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন করে থাকতো, তখন ওদেরও প্রতি রীতিমত দয়া দাক্ষিণ্য ছিল প্রকৃতির। শাখাকে জড়িয়ে ধরে থাকার উপযোগী হাত-পা, গায়ে লোম, লতায় লতায় থোকা থোকা আঙ্গুর জাতীয় ফল, প্রভৃতি কত কি? কিন্তু যেদিন সে বৃক্ষ থেকে নেমে এসে দুপায়ে দাঁড়ালো সেদিন বঞ্চিত

হল প্রকৃতির দয়া দাক্ষিণ্য থেকে।

পরোয়া করেনি তারা। জোর করে অর্জন করে নিয়েছিল বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিই তাদের দান করলো নিরাপত্তা। বলশালীর উপর হামলা না করে পশ্চাৎ অপসরণকে যুক্তিযুক্ত মনে করলো, একই খাদ্য গ্রহণ না করে বিকল্প খাদ্য গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলো। গাছের পাতা থেকে আরম্ভ করে কাঁচা মাংস, সব কিছুকেই খাদ্য তালিকাভুক্ত করে নিল।

স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার দিকে প্রবল আগ্রহও তাদের উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করার আর একটি সোপান। শৈশবাবস্থা থেকে অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করতো তারা। কাঁচা বয়সে, সেই কচি ও কাঁচা হাতদুটির সাহায্যে যথাসাধ্য পিতামাতাকে সাহায্য করতো। ঝড়বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্ম সবই গা-সওয়া হয়ে উঠতো, বন্ধুরও কণ্টকাকীর্ণ পথে চলাফেরার অভ্যাস গড়ে উঠতো, পিতার সঙ্গে শত্রুর সম্মুখীন হতো, ছোট ছোট পশু-পাখীও শিকার করতো। তাই অতি অল্পবয়সেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতো তারা। একটু বড় হলে নিজে নিজেই ঘর বাঁধতো, নিজের খাদ্য নিজেই জোগাড় করতো।

সেদিন তাদের চাহিদাও ছিল নিতান্ত কম। লজ্জা নিবারণের প্রয়োজন অনুভব করতো না, সঞ্চয়ের কিংবা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মনোভাব ছিল না। চাহিদা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। নিজেই নিজের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠতো, ভালমন্দ বিবেচনা করতেও শিখেছিল। তাই আরণ্যক পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও বংসবিস্তার করেছিল অতি দ্রুতগতিতে। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ওদের কোন কোন শাখা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদের একটি শাখার নাম নিয়ানডার্থাল মানুষ। জার্মানীর নিয়ানডার্থাল উপত্যকায় প্রথম ওদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই অনুরূপ নামকরণ।

(২) পুরাতন প্রস্তর যুগ

[খ্রীষ্টপূর্ব পঁচিশ হাজার বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চাশ হাজার বছর]

নিয়ামডার্থালদের ঠিক ঠিক মানুষ বলে চিহ্নিত করতে চাননা অনেকে। বেঁটে-খাটো চেহারা, দেহ গুরুভার, বক্র মেরুদণ্ড বিশিষ্ট্য, দৌড়াতে পারতো না, এমনকি ঋজু হয়ে হাঁটতেও পারতো না। পূর্ব বর্ণিত সিনানথ্রোপাসদের সমগোত্রীয় এবং আকৃতিতে বনমানুষ ও মানুষের মাঝামাঝি।

সম্ভবত খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চাশ হাজার বছরের কিছু পূর্ব থেকে তুষারযুগ পৃথিবীতে প্রচণ্ডভাবে হানা দিয়েছিল। বছরের পর বছর একটানা চলতে থাকে তুষারপাত ও তুষার ঝড়। সূর্যকে প্রায়ই দেখা যেত না। নদী-নালা-সাগর সবই আচ্ছাদিত হয়েছিল বরফে। পাহাড়ের মাথায় জমাট বাঁধা বরফের স্তূপ ধসের আকারে নেমে আসতো তলায় এবং বিরাট বিরাট এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিত। সে কি ভয়ঙ্কর ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং শীতলতম পরিবেশ!

হাজার হাজার বছরের সেই শীতলতম পরিবেশে জীব ও উদ্ভিদ দেহেও সূচিত হয়েছিল অতি ভয়ঙ্কর সব পরিবর্তন। বহু জীবেরও ঘটেছে বিলুপ্তি। হারিয়ে গেছে সেদিনের বিশালদেহী ম্যামথ, খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি, হারিয়ে গেছে কত উদ্ভিদ, আর হারিয়ে গেছে মানুষের কত প্রজাতি। পরিবেশটা সম্পূর্ণরূপে ওলট্‌পালট্‌ হয়ে যাওয়ায় যারা কোন-প্রকারে নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পেরেছিল তারাও পরিবর্তনের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। আর সে পরিবর্তনও এক আশ্চর্য ধরণের পরিবর্তন। নমুনা হিসাবে বলা যায়, মাত্র পঁচিশ হাজার বছরের মধ্যে একরকম আধা বনমানুষ ও আধা মানুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষ। অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছে ঐ দুর্যোগের মধ্যে। সর্বস্তরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় চির কালই উক্ত পরিবর্তন মানুষের কাছে পরম বিস্ময় হয়ে থাকবে।

সেদিনের সেই প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মানুষের

যথেষ্ট উপকারও করেছিল। সেই থেকে অনেকগুলি পরিবার একত্র-বাসের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। একরকম তাদের অজান্তেই গড়ে উঠেছিল এক একটি সমাজ। তবে সে সমাজের নির্দিষ্ট কোন আইনকানুন ছিল না।

প্রথমের দিকে একত্র বাস করলেও কেউ কারও উপরে বড় একটা নির্ভর করতো না। খাদ্য ও অস্ত্রছাড়া অন্য কোন কিছুর চাহিদা না থাকায় বুকের পাঁজরের মত রক্ষা করতো পাথরের ভোঁতা হাতিয়ারকে এবং যে যা সংগ্রহ করতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতো। শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতো সমষ্টিগতভাবে।

লাভ হয়েছে পরের দিকে। অচিরে তারা বুঝতে পারে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকার সুফল। আর যতদিন থেকে তারা ঐ সুফলটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল ততদিন থেকে আর একক থাকেনি। দল বেঁধে শিকারে যেত, আহার অন্বেষণ করতো, শত্রুর মোকাবিলাও করতো। এক সময় তাদের মনোভাবের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল যে, একক স্বার্থের কথা কেউ চিন্তা করতো না। যা কিছু ভাবনা—সবই গোষ্ঠী স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল। আর তখনই অজেয় হয়ে উঠেছিল তারা, নিত্য নতুন আবিষ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিল তারা এবং প্রকৃতির বুক থেকে জোর করে আদায় করে নিয়েছিল বাঁচার অধিকার। এক-রকম বাঁধ ভাঙ্গা জলের মত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল তাদের সভ্যতার রথ। অপঘাতে আর মরতে হল না বলে বংশ বিস্তারের দ্বারা পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছিল মানুষে মানুষে।

সেই সময় মানুষের সম্পদ ছিল একমাত্র পাথরের হাতিয়ার। সে হাতিয়ার ছোট ছোট পাথরের নুড়ি থেকে ভারী ও লম্বাটে ধরণের পাথরের ফলক। কোনক্রমে তারা হাতিয়ারকে নষ্ট হতে দিত না। শত্রুকে ঘায়েল করতে পাথর ছুঁড়তো এবং পুনরায় কুড়িয়েও আনতো। সুযোগ পেলে অপরের হাতিয়ার অপহরণ করতো, আর খাদ্য সংগ্রহের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বসে বসে কেবলই পাথর ঘষতো।

পাথরের টুকরা কিংবা প্রস্তর ফলক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না।

পাথর ভাঙ্গা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেদিনের সেই শক্ত মানুষ লোহার শাবলের মত শক্ত হাতে পাথরে পাথর ঠুকতো। খসিয়ে আনতো দু-একখানা ফলক। খরস্রোতা নদীর তীরভূমিতে যে সব গোল গোল নুড়ি পাথর পাওয়া যেতো তাকেও যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতো। চেঁছে ছুঁটে ধারাল করতে পারতোনা, কেবল যতটুকু পারে মসৃণ করার চেষ্টা করতো। বলাবাহুল্য, সেইসব অমসৃণ ও অতি সাধারণ পাথরের টুকরা তাদের কাছে ছিল সোনার চেয়ে দামী—জীবন থেকেও প্রিয়।

নিয়ানডার্থাল মানুষেরাই বহু কষ্টে পাথরের টুকরাকে ঘষে ঘষে বর্শা ফলকের রূপদান করতে পেরেছিল। ওদের উন্নত হাতিয়ার বলতে ছিল ঐ বর্শা ফলকই। হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ঘুরে বেড়াতো, কখনও লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে মারতো, আর পশু দেহকেও ছিন্ন ভিন্ন করতো ঐ ফলকের দ্বারাই।

নিয়ানডার্থাল মানুষ আদিম মানুষের উত্তরসূরী হলেও এদেরও অতিক্রম করতে হয়েছে বিবর্তনের নানা স্তর। তারপরেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে আধুনিক ক্রোম্যাদাগনন মানুষ। আদি মানব যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করেছিল, সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই সমস্ত স্তরের অধিকাংশ জীবাশ্ম হারিয়ে গেছে। পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকটি স্তরের জীবাশ্ম। ঐ জীবাশ্মগুলিকে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা স্থির করেছেন, নিয়ান-ডার্থালদের সঙ্গে পিথেকানথ্রোপাস মানুষের আকৃতিগত মিল যেন অধিক। তাই মনে করা হয়, পিথেকানথ্রোপাসরা ক্রমবিবর্তনের বহু স্তর অতিক্রম করে নিয়ানডার্থাল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরের দিকে নিয়ানডার্থালরা বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করতে করতে আধুনিক ক্রোম্যাগনন মানুষরূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

দুটি বিশেষ কারণে নিয়ানডার্থাল মানুষরা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রথমত ওরা লজ্জা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করেছিল, দ্বিতীয়ত আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। ওদের ঐ দুটি আবিষ্কারই আজকের দিনেও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক না করে পারেনা। দুটি আবিষ্কারকেই যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

যে বা যারা ঐ আবিষ্কারগুলি করেছিল, সে বা তাদের তুল্য আবিষ্কারক পৃথিবীতে কেউ কোনদিন হতে পারবে না। তাছাড়া ওরাই প্রথম গুহাবাসী হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

১। অঙ্গ আচ্ছাদানের উপায় আবিষ্কার :—

মাথার উপর খোলা আকাশ, তলার ধূ ধূ সাদা প্রান্তর—নয়ত খাড়াই উৎরাই পার্বত্য এলাকা। কোথাও কোথাও জরাজীর্ণ অরণ্য অথবা তৃণভূমি জীবনের শেষ সময়ের জন্য দিন গুণতি করছে। মানুষের তখন ঘর নেই, বাড়ী নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, এমনকি খাদ্যও সহজলভ্য নয়। বৃক্ষে বৃক্ষে আগের মত ফল ধরে না, তুষার পাতে নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট ছোট পশু পাখীকে বড় একটা দেখা যায়না, শীতল পরিবেশে অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নদী কিংবা জলাভূমিতে মাছ, কাঁকড়া, গুগলি প্রভৃতি পাওয়া যায় না, জল বরফে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তবু প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে যে সব পশু ঘুরে বেড়াতো তাদেরই বুদ্ধি করে আতুড় গায়ে মানুষকে শিকার করতে হতো ক্ষুধার তাড়নায়। আকাশ থেকে ঝরে তুষার, দিনের অধিকাংশ সময় সূর্যের মুখ ঢাকা থাকে, কনকনে হাওয়া বয়, তবু পেটের জ্বালায় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাহিরে বেরুতে হয়।

হয়ত সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত তুষার পাতের বিরাম ছিল না। গর্তের মুখে লম্বা লম্বা ঘাস চাপিয়ে এবং তলায় বহুকষ্টে সংগ্রহ করা শুকনো পাতার গাদায় শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল একটি পরিবার। পরিবারে হয়ত ছিল দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও পিতামাতা।

বেলা হল। আকাশের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে যখন সূর্যরশ্মি আত্ম-প্রকাশ করলো তখনই চারজনে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। তারপর হাতে পাথরের নুড়ি ও বর্শাফলক নিয়ে এগিয়ে চললো শিকারের খোঁজে। চলতে চলতে একসময় উপস্থিত হল একটি পাহাড়ের কাছে। হঠাৎ চোখে পড়লো, বিরাট এক ভালুক অবলীলাক্রমে নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। তুষার কণার উপর দিয়ে হাঁটছে, তবু গতি তার স্বচ্ছন্দ,

এইমাত্র সূর্যকিরণ আত্মপ্রকাশ করলো তবু গায়ে কাঁপুনি নেই।

ভালুককে দেখে পরিবারটি আত্মগোপন করলো বিরাট এক পাথরের চাঁইয়ের অন্তরালে। পিতা মনে মনে ভাবলো, ভালুকদের শীত নেই কেন? সে কি তার গায়ের লম্বা লম্বা লোমের জন্য?

ধীরে ধীরে ভালুকটি তাদের সন্নিকটবর্তী হল। যখনই নাগালের মধ্যে এসে গেল, তখন চারজনেই ছুঁড়ে মারল পাথর। তারপর আর এক ঝাঁক। এইভাবে যতক্ষণ না ভালুকটি গড়িয়ে পড়লো ততক্ষণ ধরে চললো পাথরের বৃষ্টি।

ছুটে গেল সবাই। পিতা ও মাতা বর্শার ফলক বিদ্ধ করে হত্যা করলো ভালুকটিকে। সবার চোখে মুখে আনন্দের শিহরণ। কিচির মিচির করতে করতে ভালুকটাকে টানতে টানতে হাজির হল বাসায়।

সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার মুখে। পুনরায় শীতে কাঁপতে লাগলো তারা। ছেলে মেয়ে দুটিরই বেশী কষ্ট হচ্ছিল। পিতা বুদ্ধি করে খসিয়ে নিল চামড়াটা। তারপর চামড়াটাকে চারটুকরা করে চারজনে জড়িয়ে নিল গায়ে।

সত্যি, সে এক অপূর্ব শিহরণ! কোথায় শীত আর কোথায় কাঁপুনি? ছেলে মেয়ে দুটি লাফাতে আরম্ভ করলো আর স্ত্রীপুরুষে তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। মুখে তাদের ভাষা ছিলনা। তাই আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য কিচির মিচির শব্দ করতে লাগলো।

আরও অনেক পরিবার এইভাবে ঘুরে বেড়াতো। তারা ওদের দেখলো এবং অনুকরণও করলো। যারা ভালুক পেলনা, তারা শিকার করলো চিতা, হায়না ইত্যাদি। পশুচর্ম এবার থেকে আর কেউ নষ্ট করলো না, অঙ্গ আচ্ছাদনের কাজেই ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো।

এতদিন মানুষের সম্পদ ছিল একমাত্র পাথরের হাতিয়ার। এবার আর এক সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হলো। সে সম্পদ তার পরিধেয়—তার লজ্জা নিবারণ ও শীত নিবারণের একমাত্র হাতিয়ার। ফল ও শিকার করা পশুমাংসকে তারা সংরক্ষণ করতো না। কারণ, এগুলো কয়েকদিনের

মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেতো।

২। গুহাবাসী হলো মানব :—

তুষার যুগ আরম্ভ হওয়ার আগে মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করতো। রাত্রিবাস করতো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে, নদীতীরে বড় বড় গর্তে, ঝোপ-ঝাড়ের তলায় ইত্যাদি জায়গায়। ক্রমাগত শৈত্য প্রবাহের ফলে পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। মাথা বাঁচাতে দীর্ঘকাল তাদের হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল এবং বহু প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। অবশেষে মুখ ফিরিয়েছিল পূর্বের ফেলে আসা সেই অরণ্য ও পর্বতের দিকে।

সে সময় পর্বতের সানুদেশ ও অরণ্য নিরাপদ ছিলনা। বিচরণ করতো নরখাদক হিংস্র জন্তুরা। তাছাড়া বসবাস করতো অতীতের ভীষণাকার হিংস্র সরীসৃপদের বংশধর।

বিচরণ করতে করতে একদিন টের পেলো, এখানে ওখানে পর্বত-গাত্রে রয়েছে বেশ বড় বড় গহ্বর। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই গহ্বর গুলিতে বাস করে বাঘ, সিংহ, হায়না, ভালুক, চিতা প্রভৃতি কত হিংস্র জন্তু। যদিও অভিযানের ভয়ঙ্কর নেশাটা অরণ্যচারী যাযাবর মানুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল তবু হঠাৎ কেউ সাহসী হয়ে গুহায় প্রবেশ করতে পারেনি। দুর্বার কৌতূহল নিয়ে কেবল দূর থেকে অবলোকন করতো আর গা ছম ছম করা নিকষ কালো আঁধারের কথা চিন্তা করতো।

একদিনের একটি ঘটনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে—মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় শুভ মুহূর্ত। এক যুবা পাথরের হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে শিকারের অপেক্ষায় বসে ছিল গুহা থেকে অল্পদূরে এক গাছের আড়ালে। ভাবটা এই, গুহা থেকে কোন জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে এলেই অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করবে।

হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো সে। দেখলো, সাক্ষাৎ যমদূতের মত বিশাল এক ম্যামথ ঘাড় উঁচিয়ে, অরণ্য তোলপাড় করতে করতে ছুটে আসছে তার দিকে। উপায় না দেখে যুবাটি বাধ্য হয়ে

নিকটস্থ এক গুহামুখে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সে সাধারণ বুদ্ধিতে টের পেয়েছিল, গুহার মধ্যে যারা থাকে তার সঙ্গে লড়তে পারা যাবে কিন্তু ভীষণাকার এই জন্তুটার সঙ্গে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাবেনা।

সৌভাগ্যক্রমে সেই গুহায় কোন হিংস্র জন্তু ছিল না। তবুও দুরু দুরু বুকে একবার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। এবার আশ্চর্য হওয়ার পালা। গুহাকে যতদূর অন্ধকার ভেবেছিল, ঠিক ততখানি নয়। ফাটল দিয়ে বাঁকাচোরা পথে আলোক এসে পড়েছে, তিন দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, মাথার উপর আচ্ছাদন। তুষারপাতের ভয় নেই, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া নেই, মাত্র একটা দিক ছাড়া অন্যদিক থেকে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয় নেই। একেবারে খাসা জায়গা।

যুবাটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডেকে এনেছিল তার দলের অন্যান্যদের। পাথরের ছোট ছোট চাঁইকে সাজিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে নির্ভয়ে ও সুখে নিদ্রা গেল। ওদের দেখাদেখি আরও অনেক পরিবার সেদিন গুহাবাসের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিল। এবার আর তাদের পাথর ও পশুচর্মকে বয়ে বেড়াতে হলো না, নিতান্ত যারা শিশু তাদেরও বয়ে বেড়াবার প্রয়োজন হলনা, অসুস্থদেরও নিরাপদ আশ্রয় লাভ হলো।

প্রথম প্রথম গুহা অধিকারের জন্য রীতিমত হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রাণত্যাগও করতে হয়েছিল অনেককে। কিন্তু গুহা অধিকারের পর তাদের সুদিন আসে। দ্রুত বংশবিস্তারের ফলে মাত্র কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে সমগ্র এশিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের যত পর্বত গুহা ছিল, সবগুলিকেই অধিকার করে নিয়েছিল।

পাশাপাশি গুহা গুলিতে যারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে অচিরেই গড়ে উঠে একটা সহঅবস্থানের মনোভাব। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকে তারা দলবদ্ধভাবে বাস করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাদের অজান্তেই গড়ে উঠে একটা সমাজ। সে সমাজের কোন নিয়ম-কানুন কিংবা কোন বিধিনিষেধ তারা আরোপ করতে পারেনি। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল, এই ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু অধ্যুষিত পরিবেশে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় একক অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব।

বড়-সুন্দর ছিল তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী। পাশাপাশি কয়েকটি গুহায় যারা বাস করতো তাদের পুরুষেরা দলবদ্ধ হয়ে শিকারে বেরিয়ে যেতো। মেয়েরাও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফলমূল আহরণের জন্য বনপথে এগিয়ে যেতো। বাসায় পড়ে থাকতো অবোধ শিশু, রুগ্ন ও অসমর্থ বৃদ্ধবৃদ্ধারা। ওরাই ছোট ছোট শিশুদের দেখাশোনা করতো, আর একটু যারা বড় তাদের কাছে ছবির মাধ্যমে আপন অভিজ্ঞতা ও শিকারের কৌশলগুলি ব্যক্ত করতো। মোট কথা কেউ বসে থাকতো না। কিছু না কিছু কাজে লিপ্ত থাকতো সব সময়।

সন্ধ্যার আগে ফিরে আসতো সবাই। পুরুষদের শিকার করা পশু এবং মেয়েদের সংগ্রহ করা ফল-মূল শাক-পাতা প্রভৃতি পরমানন্দে সবাই মিলে ভোজন করতো। তাতে ছিল সবার সমান অধিকার। অধিক কষ্ট করার জন্য বেশী পাওয়ার কথা কারও মনে আসতো না। খাবার যেদিন বেশী পাওয়া যেতো, সেদিন সবাই বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতো। আর যেদিন কম সংগ্রহ হতো সেদিন কম করেই খেতো। কম সংগ্রহ হওয়ার জন্য বিমর্ষ কেউ হতোনা বা সঞ্চয়ের কথাও চিন্তা করতোনা।

খাওয়ার সময় সবাই মিলে আনন্দও করতো। তাদের সেই আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতো হাসিতে ও গলার স্বর লহরীতে। আজকের অবিধায় তাকে ভাষাও বলা যাবেনা, গানও বলা যাবেনা। সেগুলি ছিল কতকগুলি শব্দ—যা কেবল সেই দলের লোকেরাই বুঝতে পারতো। হয়ত সেই অর্থবোধক শব্দগুলি থেকেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছিল কথা ও সুর।

গুহাবাসের আগে নারী ছিল পুরুষের কাছে সম্পদ বিশেষ। শক্তিমান পুরুষ জোর করে নারীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। বয়স হলে নিজেরাই গায়ের জোরে অথবা কৌশলে বন্দী করতো মেয়েকে। সেদিনের নারী ছিল ভয়ঙ্করী। অর্থাৎ সহজে ধরা দিত না পুরুষের কবলে। তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখর দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে নারীত্বের মধুর মহিমা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলনা। আজকের মায়েদের তুলনায় তাদের সন্তানস্নেহ ছিল আরও প্রবল। বানর কিংবা হনুমানের

মত যখন ওরা গাছে গাছে ঘুরতো তখন বলশালী পুরুষরা পছন্দ করতোনা পুত্র সন্তানকে। দেখা মাত্রই বধ করতে চেষ্টা করতো। সেই অন্ধকার দিনগুলিতে একমাত্র জননীর অত্যধিক সন্তান স্নেহই টিকিয়ে রেখেছিল পুত্র সন্তানদের। পুরুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সেকি প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন। পুত্র সন্তানকে বুকে ধারণ করে অতি সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াতো, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতো, কতদিন উপবাসে কাল কাটাতে হতো। যেন বুকের প্রতিটি রক্তবিন্দু সন্তানের জন্য ব্যয় করে মাতৃত্বের চরম পরীক্ষা দিতে হতো।

গুহাবাসের বেশ কিছু আগে থেকে নারীর সে দায়িত্বটুকু পুরুষেরাও পালন করতে শুরু করে। পরিশেষে পিতার স্নেহ প্রবল হয়ে উঠে। সমস্ত কাজে পিতা সঙ্গে করতো ছোটদের। পিতা কিংবা পিতৃস্থানীয়দের সঙ্গে লাঠি ধরতো, পাথর ঠুকতো, কাঁধে চেপে শিকারে যেতো, শিকারকে আক্রমণ করতো, আবার শিকারকে টানতে টানতে ঘরে আসতো।

সে সময় নারীদের শক্তিও বড় কম ছিলনা। পাথরের হাতিয়ার নিয়ে দলবেঁধে বনে বনে ঘুরতো। শিকার সামনে পড়লে কোনমতেই ছেড়ে দিত না। বাঘ, সিংহ ও বাইসনের সঙ্গে যুদ্ধও করতো। অপরদিকে রুক্ষ-চুলে দু চারটা বনফুলও গুঁজে দিতো। কোমলতা ও হিংস্রতা দুয়ের অদ্ভুত সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সেদিনের নারী হৃদয়।

৩। আগুন জ্বালাতে শিখলো মানুষ ঃ—

পণ্ডিতদের মতে মানুষ আগুন জ্বালিয়েছিল বজ্রপাতের আগুনকে নিয়ে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পাথর ঠুকতে গিয়ে আগুনের ফুলকির সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল। এবং আগুনের সেই ফুলকি থেকে তারা অগ্নি প্রজ্জ্বলনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। যাঁরা দাবানল থেকে মানুষ অগ্নি সংগ্রহ করেছিল বলে মনে করেন তাঁরা বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। কারণ, যে সময় মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল সে সময় চলছিল শীতল যুগ। গাছপালার অবস্থা হয়ে উঠেছিল একেবারে শোচনীয়। বছরের অল্প সময় যখন শীতের প্রকোপটা একটু হ্রাস পেতো

তখন একটু সতেজ হয়ে উঠতো গাছপালা। বর্ষা-ঝড়-বিদ্যুৎ অবশ্যই লেগে থাকতো।

ধরা যেতে পারে, কোন একটি গুহার কাছে বজ্রপাতের ফলে একটি গাছে আগুন ধরেছিল। তার উত্তাপ ও আলো দুইই লাভ করেছিল গুহায় বসবাসকারী মানুষরা। সেদিন আকাশের ঐ বিদ্যুৎ চমকের মতই তাদের কারও মাথায় এসেছিল আগুনকে বন্দীকরার উপায় উদ্ভাবন করতে। এমনও হতে পারে, সেই প্রজ্জ্বলিত গাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিল আগুন। অথবা কোন একদিন শুকনো পাতার উপর বসে কেউ পাথর ঠুকছিল। তারপর এক সময় আগুনের ফুলকি পাতার উপর পড়ে জ্বলে উঠেছিল। আর মুহূর্ত মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল গুহার নিকষ কালো আঁধার।

যে ভাবেই আগুন আবিষ্কৃত হোক না কেন, ঐ আবিষ্কারটিই তাদের সভ্যতাকে আমূলভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অন্ধকারকে সে আর ভয় করলো না। হাতে পবিত্র অগ্নিশিখা নিয়ে কেবল এগিয়েই চললো। বিরাট বিরাট হিংস্র জন্তুরাও এবার তাদের কাছে ভিড়তে সাহসী হলো না।

কাঁচা মাংস খাওয়ারও দিন গেল ফুরিয়ে। হয়ত কোন কৌতূহলী শিকার করা মাংসকে অগ্নিতে সমর্পন করেছিল। তারপর দগ্ধ মাংস মুখে পুরে অমৃতের স্বাদ লাভ করেছিল অমৃতের পুত্রগণ।

আদি মানবের ব্যবহৃত বহু গিরিগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ওরা পরিষ্কার থাকতে জানতো না। তাই সেই সব গুহা থেকে পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, অগ্নিকুণ্ড, ছাই, পশুর কঙ্কাল ইত্যাদি কত কি! পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, খ্রীষ্টজন্মের পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে পর্যন্ত এই সব গুহা ব্যবহার হয়েছিল। সেই সব গুহা থেকে কোন শস্য পাওয়া যায়নি। অথচ পুরুষাণুক্রমে তারা সেখানে বাস করতো। মৃতদেহের করবও দিতো গুহার ভেতরে। দীর্ঘকাল পরে জঞ্জালে জঞ্জালে গুহা ভরে উঠলে অন্য গুহার খোঁজ করতো। অথবা জনসংখ্যা বেড়ে উঠলে অন্য গুহার খোঁজে তৎপর হয়ে উঠতো।

(৩) মধ্য প্রস্তর যুগ

(আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০ অব্দ পর্যন্ত)

পৃথিবীর বুকে যে ভয়ঙ্কর তুষার যুগটা হানা দিয়েছিল সেটি চলতে থাকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০০ অব্দ পর্যন্ত। তারপর নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে ধরণী, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত বরফ এতদিনে গলতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় কত নতুন নদ-নদী। পুরাতন নদীগুলিও ফিরে পায় তার স্রোত-ধার। কিছুকালের মধ্যেই প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতি। পৃথিবীর ঋতুরঙ্গশালাতেও আবির্ভূত হতে থাকে নতুন নতুন ঋতু। জলে, স্থলে, বনতলে সর্বত্রই জাগে এক অপূর্ব শিহরণ। আর সেই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ। তবে সেই নিরাপদ আশ্রয়কে হঠাৎ পরিত্যাগ করতে পারলো না। সারাদিন বনে-বনে ঘুরতো, শিকারের সন্ধান করতো অথবা ফলমূল সংগ্রহ করতো, তারপর দিনের শেষে ফিরে আসতো যে যার আস্তানায়।

সুদীর্ঘ তুষার যুগের মধ্যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের নানা পরিবর্তন এসেছিল। আর্দ্র পরিবেশের সঙ্গে যারা খাপ খাওয়াতে পারেনি তাদের সবাইকে সরে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। গুহাবাসী মানবের বংশধারার মধ্যেও এসেছিল নানা পরিবর্তন। হারিয়ে গিয়েছে তাদের কত প্রজাতি। সহস্র সহস্র বছরের তুষার যুগের মধ্যে কেমন করে যে তারা হারিয়ে গেল সর্বস্তরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় তা অনেকখানি অন্ধকারের মধ্যে থেকে গেছে। পাওয়া যায়নি ন্যুব্জদেহ নিয়ানডারথাল মানুষের ঠিক পরের স্তরগুলি। কেবলমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীষ্টজন্মের পঁচিশ হাজার বছর আগে আবির্ভূত মানবের কঙ্কাল। ওরাই ক্রোমা-গনন মানুষ। আজকের মানুষের সঙ্গে কেবল ওদেরই সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ফ্রান্সের ক্রোমাগনন নামক একটি স্থানে কয়েকটি গুহায় ওদের কঙ্কাল, ভুক্তাবশেষ, ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সেই কারণে উপরোক্ত নামকরণ।

আগেই উল্লেখকরা হয়েছে, সেদিনের গুহাবাসী মানব পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন থাকতে জানতোনা। জানতোনা ঘরদোর সাফ করতে এবং জঞ্জালকে বাহিরে ফেলে আসতে। দিনের পর দিন গুহার ভেতরে জমতো আবর্জনার স্তূপ। অনেকে আবার মনে করেন, তারা গুহার ভেতরে মৃতদেহকে কবরও দিতো।

মহাকালের ক্রুর কটাক্ষকে উপেক্ষা করে সবগুলি গুহা অবিকৃত থাকতে পারেনি। কোনটি ভেঙ্গে পড়েছে, কোনটি ধূলাবালি ও আবর্জনায় ঢাকা পড়েছে, আবার কোথাও কোথাও পাহাড়ী নদী আত্মসাৎ করেছে। এসব সত্ত্বেও মহাকাল পারেনি তাদের সব চিহ্নকে মুছে ফেলতে। তাদের কঙ্কাল এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কিছু কিছু সঞ্চিত হয়েছে নদীবক্ষে। যুগের পর যুগ ধরে সেগুলির উপর জমে উঠেছে পলিমাটির স্তর। কঙ্কালগুলি পরিণত হয়েছে জীবাশ্মে এবং তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলি তেমনই অক্ষত হয়ে আছে।

ক্রোমাগনন গিরিগুহাগুলি থেকে ভূতত্ত্ববিদরা লাভ করেছেন বেশ কিছু নরকঙ্কাল। সেই সঙ্গে তাঁরা পেয়েছেন হায়না, বলগা হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর হাড়। মনে করা হয়, ক্রোমাগননরা ঐ সব পশুদের মাংস ভক্ষণ করতো। ওদের কঙ্কাল দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, ওরা ছ ফুটেরও বেশী দীর্ঘ ছিল। অথাৎ দীর্ঘাকৃতি ছিল তারা। ওদের অস্ত্রশস্ত্র পাথরের হলেও যথেষ্ট উন্নত ছিল। হাতিয়ারগুলি আদৌ ভোঁতা নয়। চেঁচে ছুলে বেশ মসৃণ করতো।

প্রতিটি গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে ছাই ও অগ্নিকুণ্ড। পণ্ডিতেরা মনে করছেন, ক্রোমাগননরা রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করতো। কিন্তু কোন শস্য না পাওয়ায় ধরে নেওয়া হয়েছে, ওরা কৃষিকাজ জানতো না।

ক্রোমাগনন মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। উন্নত ললাটদেশ ও নাসিকা, দীর্ঘ ও ঋজুদেহী, টানাটানা চোখ, ঘনকৃষ্ণ কেশদাম ও ভ্রূযুগল এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন। চামড়ার পরিধেয় তারা ব্যবহার করতো বটে, কিন্তু আনাড়ির মত কোমরে জড়াতো না। দস্তুর মত চামড়াকে কেটে এবং সেলাই করে পরিধান করতো।

তাদের হাতিয়ার কেবলমাত্র পাথরের ছিল না, পশুর শিং ও হাড় দিয়েও হাতিয়ার বানাতো। হাড় ও শিং দিয়ে তারা দরকারী জিনিস-পত্রও প্রস্তুত করতো। পাওয়া গেছে বলগা হরিণের শিং থেকে তৈরি বল্লম, শিং ও পাথরের তৈরি কুরুনি, কাঠ কাটার জন্য পাথরের তৈরি কাটারি, ইত্যাদি কত কি?

এক সময় ক্রোমাগনন মানুষেরা এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞানীদের আরও ধারণা, তুষারযুগের শেষের দিকে ওরা বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে আমেরিকা মহাদেশেও উপস্থিত হয়েছিল। উক্ত মতের সমর্থকরা মনে করেন, সে সময় বেরিং প্রণালী অনেকখানি সঙ্কীর্ণ ছিল এবং বছরের বেশীর ভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকতো। অনেকের আবার বিশ্বাস ক্রোমাগননরা পরবর্তীকালে মালয় থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। এক কথায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা।

ক্রোমাগননরা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ। প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে তারা এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতো না। জোর করে আদায় করে নিতো বেঁচে থাকার উপাদান। অপরদিকে মধ্যযুগের ভৌগোলিক-অভিযানকারী সেই ভাইকিংদের চেয়েও ছিল দুঃসাহসী।

দলবদ্ধ ছাড়া ওড়া এককভাবে বাস করতো না। দলগত স্বার্থ ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা কেউ চিন্তা করতো না। তাদের সমাজে ছিলনা ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, মালিক-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা। দলগত কোন্দলও ছিল না, তাই সারা পৃথিবীটাকে ওরা জয় করে নিয়েছিল।

অদ্ভুত ছিল তাদের জীবনাদর্শ। সারাদিন শিকারের জন্য ঘুরে বেড়াতো এবং দিনের শেষে শিকারীরা বীরদর্পে ফিরে আসতো বাসায়। তখন নারী, শিশু-বৃদ্ধ, সবাই ঘিরে দাঁড়াতো তাদের—যেন অভ্যর্থনা জানাতো। অতঃপর রান্না-বান্না, খাওয়া ও স্ফূর্তি। শাসক-শোষক-বিহীন, আত্ম-পর ভেদাভেদহীন অদ্ভুত সে জীবন। সেদিনের মানুষ সুখাদ্যটা নিজের ছেলের মুখে তুলে দিতে শেখেনি, দলের সবাইকে

ফাঁকি দিয়ে নিজের পেটটাকে চিনতে শেখেনি, আর খাটতে গিয়ে দু-দণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার কথাও কেউ ভাবতো না। সেদিন মায়েরা আপন সন্তানকে কেবল লালন পালন করতো না, অম্লানবদনে আপন স্তন্য দান করতো যে কোন মাতৃহারার মুখের পানে।

রুগ্ন ও অসমর্থ যারা ছিল তারাও বঞ্চিত হতো না খাদ্যের ভাগ থেকে। তবে বসে থাকা তাদের ছিল স্বভাব বিরুদ্ধ। যতক্ষণ দেহে একটু শক্তি থাকতো ততক্ষণ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে যেতো। কম বেশী কাজ করার জন্য দলের কেউ কিছু মনেও করতো না। প্রকৃত সাম্যবাদী ছিল ওরা। আজকের দিনে চিন্তা নায়কেরা যে সমাজের স্বপ্ন দেখেন, তাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিল আমাদের সেই পূর্ব-পুরুষেরা। তাই মানব সভ্যতা এত অল্পদিনে এমন চরমভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

ক্রোমাগননদের আবিষ্কারের সংখ্যাও বড় কম নয়। ওরাই যথার্থ ভাষার ব্যবহার করেছিল, ছবি আঁকতে শিখেছিল, তীর ধনুকের ব্যবহার করেছিল এবং রান্না করার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। নিম্নে তাদের আবিষ্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা গেল।

মানুষের মুখে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

মানুষের মুখে ভাষা এক আধ বছরে কিংবা এক-আধ হাজার বছরেও আসেনি। ভাষা আসতে লেগেছিল লক্ষ লক্ষ বছর। শেষে চরম পরিণতি লাভ করেছিল ঐ ক্রোমাগননদের মুখে। ওরাই ভাষাকে প্রকৃত ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গড়ে তুলেছিল। তাই ভাষার ইতিহাস সুদীর্ঘ।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ বৃক্ষশাখা থেকে মাটিতে নেমে এলে এবং দুপায়ে দাঁড়াতে শিখলে তার শরীরে নানা পরিবর্তন আসতে থাকে। হাত দুটো শক্ত ও মজবুত হওয়ায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো এবং ধীরে ধীরে মেরুদণ্ডটাও একেবারে সোজা হয়ে উঠলো (ক্রোমাগনন মানুষ)। এদিকে হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকায় তাদের কাটা-

ছেঁড়ার কাজ আর দাঁত দিয়ে করতে হলো না। ফলে দাঁতের গঠনের এল পরিবর্তন, মুখ হল চ্যাপ্টা, চোয়াল হল নমনীয়। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জিভের নড়াচড়া করার ক্ষমতাবৃদ্ধি। অপরদিকে মস্তিষ্কেরও হলো উন্নতি। অবশেষে মুখমণ্ডলের ও জিভের পরিবর্তন একদিন তাদের মুখে দিল ভাষা। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছরের তপস্যায় মানুষ আয়ত্ত করেছে ভাষাকে।

ভাষার সূত্রপাত হয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করার সময় থেকে। গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার ফলে প্রয়োজন হয়েছিল নিজেদের মধ্যে মনের ভাব আদান-প্রদান করার। প্রথমে উক্ত কাজটি সম্পন্ন হতো আকারে ও ইঙ্গিতে। ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যায়, এও যেন অনেকটা তেমনই ছিল। যেমন ধরা যেতে পারে, ঘরের পোষা কুকুরটা পরিবারের কাউকে দেখলে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে এবং কুঁই কুঁই শব্দ করে। শব্দটি তার আনন্দের অভিব্যক্তি। আবার অপরিচিত কাউকে দেখলে গম্ভীর আওয়াজ তুলতে তুলতে চারদিক সচকিত করে দেয়। এক্ষেত্রে তার আক্রোশের অভিব্যক্তি।

আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মাঠে একটি বলদ আর একটি বলদকে দেখলে শিং ও খুর দিয়ে মাটি আঁচড়ায় এবং গম্ভীর আওয়াজ তুলে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে•আহ্বান জানায়। আদি মানব অনেকটা এই ধরণেরই মনোভাব প্রকাশ করতো বলে অনেকের বিশ্বাস। মুখে ও হাতে ইসারাও করতো। তবে এইসব ভাবভঙ্গিকে ও মুখের আওয়াজকে কিছুতেই ভাষা বলা যাবে না। কারণ, ভাষা হচ্ছে বাকযন্ত্র, কণ্ঠনালী, ঠোঁট, মুখ প্রভৃতির উপর অধিকার স্থাপন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থবোধক শব্দ প্রকাশ করা—যা দলের সবার হবে বোধগম্য এবং সবাই ব্যবহার করবে।

অনুরূপ ভাষা আয়ত্ত করতে মানুষকে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করতে হয়েছিল। কারও কারও মতে ভাষার পরিণতি ক্রোমাগনন মানুষের মধ্যেও ঘটেনি, ঘটেছিল আরও পরে। অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র হাজার ছয়েক বছর আগে। এবং পূর্বে মানুষে কেবল আকারে ইঙ্গিতে, চিৎকারে,

ছবি এঁকে প্রভৃতি নানা উপায়ে ভাব প্রকাশ করতো।

বিশেষজ্ঞদের মতে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ প্রথম প্রথম পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকে শব্দগুলি অনুকরণ করেছিল। যেমন, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে, ভালুক গর গর করে, কাক কা-কা করে, বেড়াল মিউ মিউ করে ইত্যাদি। ঘেউ ঘেউ, প্যাঁক প্যাঁক, গর গর, কা-কা ইত্যাদি শব্দ নকল করে সেই সেই জীবজন্তুদের বোঝাতে চেষ্টা করতো। অপরদিকে তারা দেখতো কল কল ধ্বনিতে নদী বহে যায়, ঝুরু ঝুরু পাতা কাঁপে, শন শন বায়ু বয়, কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনাগুলিও তাদের মনে রেখাপাত করেছিল এবং ঐ শব্দগুলিও অণুকরণ করে একে অপরের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করতো। কারণ হিসাবে পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেন, যে কোন ভাষায় এই জাতীয় শব্দ নিতান্ত অল্প নেই। বিস্ময়, আনন্দ, শোক, দুঃখ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করতে গিয়েও স্বাভাবিকভাবে তাদের মুখে এসেছিল উঃ, আঃ, ইস্ প্রভৃতি শব্দ। ধরা যেতে পারে, শোকাভিভূত মহাকবির মুখ থেকে স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয়েছিল "মা-নিষাদ···" প্রভৃতি শব্দ। তবে আদি মানবের স্বাভাবিক শব্দগুলি কোন অর্থবোধক ছিল না—যেমনটি দেখা যায় না ছোট শিশুর আবোল-তাবোল কথার মধ্যে।

পণ্ডিতেরা মানুষের মুখে ভাষার মূলে কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তত্ত্বগুলি প্রধানত "ডিডাং থিওরি" বা টুং টাং তত্ত্ব, "গেসচার থিওরি" বা অঙ্গভঙ্গি তত্ত্ব, "পু পু থিওরি" বা উঃ আঃ তত্ত্ব। উক্ত তত্ত্ব-গুলির মূল বক্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তত্ত্বগুলি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হলেও সর্বজনস্বীকৃত নয়। প্রত্যেক তত্ত্বের মধ্যেই কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে। তাছাড়া কোন একটি তত্ত্ব সবকিছুর মীমাংসা বা ব্যাখ্যা করতে পারে না। তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, আদিতে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকেই শব্দচয়ন করেছিল।

কোন কোন বিজ্ঞানী শিশুর ভাবভঙ্গি ও আচার ব্যবহারের তুলনা করে আদিম মানুষের মুখে ভাষা সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। শিশুরা যখন কথা বলতে শেখে তখন মা-মা, দা-দা, বা-বা, পা-পা প্রভৃতি

শব্দগুলি আপনা হতেই তাদের মুখ থেকে নির্গত হয়। এগুলি কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ নয়—যেন আপন খেয়াল। এইসব শব্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন অর্থ হয় না তবু উক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে তারা মনের ভাবকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

শিশুরা বড় অনুকরণ প্রিয়ও। যা শোনে তাই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। আদি মানবও সেইভাবে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিল।

অপরদিকে দেখা গেছে, একটা বড় বাক্যকে ছোটরা দু একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে। মায়ের কোলে শিশু আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন হাত নাড়তে নাড়তে বলে "আ-আ-তি"। মা ঠিক বুঝে নেন, খোকা বলছে "আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা"। আবার মায়ের কোলে খোকা যখন অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করে তখন বলে "নে-নে"। মা বুঝতে পারেন না খোকা কি চাইছে। এখানে 'নে' শব্দটি খোকার ঈপ্সিত কোন জিনিস। আনন্দিত হয়ে যে শব্দগুলির সহযোগে সে গান ধরে সে শব্দেরও কোন অর্থ হয় না। অথচ শব্দগুলি খোকার আনন্দের অভিব্যক্তি। আদিম মানুষের মুখে সেদিন এই ধরণের নানা শব্দ ও শব্দযুগল এসেছিল— যা দিয়ে তারা আশেপাশের বস্তুরাশি, দুঃখ, শোক, হর্ষ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করতো। কালক্রমে সেগুলির কিছু কিছুও তাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

যাই হোক ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত পোষণ করে থাকেন। বর্তমানের ভাষাতত্ত্ববিদেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আরও দুটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তত্ত্ব দুটি হল (১) সাঙ্গীতিক তত্ত্ব বা মিউজিক্যাল থিওরি এবং (২) সংযোগতত্ত্ব বা কনট্যাক্ট থিওরি। প্রথম তত্ত্বের প্রবক্তা বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী অটো জেসপারসন। তাঁর মতে মানুষের ভাষার আদিতে আছে গান। উত্থান পতনের মাধ্যমে সে প্রথম কণ্ঠস্বরকে আয়ত্ত করেছিল। ফলে একদিন তার মুখে এসেছিল ভাষা।

দ্বিতীয় তত্ত্বের প্রবর্তক জি. রেভেস্‌ৎস। এঁর মতে মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ থেকে ভাষার উদ্ভব এবং উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের মধ্যে

সংযোগ স্থাপন। ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রেভেস্ৎস কয়েকটি পর্যায়েরও উল্লেখ করেছেন। পর্যায়গুলি যথাক্রমে শব্দ, চিৎকার, আহ্বান ও কথা। অর্থাৎ আদিতে মানুষ কেবলমাত্র ইতর জন্তু-জানোয়ারদের মত শব্দ করতে পারতো। পরবর্তী পর্যায়ে যখন সে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে শিখলো তখন পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের জন্য কেবল চিৎকারই করতো। উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। গাছে বসবাসকারী কাঠ-বেড়ালিরা যদি তলায় তাদের চির শত্রু বেড়ালকে দেখতে পায় তাহলে চিৎকার শুরু করে দেয়। পাখীদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অনেক জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

তৃতীয় পর্যায় হলো আহ্বান। অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপন করার উন্নত পদ্ধতি। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে আহ্বানের শব্দকে আয়ত্ত করার মধ্যেই ভাষা নিহিত। শিশু যখন মাকে আহ্বান করে তখন সে শব্দ এত সুন্দর ও সাবলীল যে, মা ছাড়া অন্যান্যরাও বুঝে নেয়। জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আহ্বান আছে। মাঠে গরুর পালে অসংখ্য গোবৎসের মধ্যে কোন বিশেষ মা যদি তার সন্তানকে আহ্বান জানায় তখন একটিই সে আহ্বানে সাড়া দেয়। কিংবা কোন একটি বাছুর যদি মাকে আহ্বান করে তখন তার নিজের মা-ই ছুটে আসে। অথচ অপরে আসে না। এমন আরও কত ঘটনা দেখা যায়। মা বেড়াল শিকার ধরে আহ্বান জানালে শাবকরা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। উপরে চিল উড়তে দেখলে অথবা কুকুর বেড়াল দেখলে মুরগী এক বিচিত্র ধরণের শব্দের মাধ্যমে তার শাবকদের কাছে ডেকে নেয় এবং পালকের তলায় লুকিয়ে ফেলে। অতএব প্রত্যেক জীবজন্তুরই আহ্বানের ভাষা আছে এবং তাদের নিজেদের কাছে সে ভাষা বিশেষ অর্থবোধকও।

এইভাবে একেবারে চতুর্থ ও শেষ পর্যায়েই মানুষের মুখে এসেছে ভাষা এবং সভ্যতার চরম বিকাশও সেই থেকে ধরতে হবে। তবে কত কালের তপস্যায় যে তারা ভাষা আয়ত্ত করেছিল তা সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না। শুধু এইটুকু বলা হয়, মানুষ কাজ চলার মত ভাষা আয়ত্ত করেছিল মধ্য প্রস্তর যুগে তথা ক্রোমাগনন মানুষের আমলে।

যাঁরা ভাষার উদ্ভব কালকে আরও পরে স্থান দিতে চান তাঁদের বিপক্ষে অপর দলের যুক্তি—যে মানুষ দল বেঁধে বাস করতো, আগুন জ্বালাতো, মৃতদেহকে কবর দিতো, রান্নাবান্না করতো, তার মুখে ভাষা ছিল না এমনটি হতে পারে না।

অনেকে যাঁরা মনে করেন মানুষ কথা বলার আগে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতো, তাঁদের যুক্তির মূলেও কতকগুলি কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, আদি মানবকে শিকার করেই জীবন ধারণ করতে হতো এবং বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হতো। হিংস্র জন্তুর সামনে পড়লে একে অপরকে কিভাবে সাবধান করে দিতো? সে কি তখন ছবি আঁকতে বসতো? তাহলে প্রত্যেককে কি ছবি আঁকার সরঞ্জাম সঙ্গে করতে হতো? অতএব এই যুক্তিকেও সমর্থন করেন না অনেকে। এঁদের মতে চিত্র থেকে লিপির উদ্ভব কিন্তু ভাষার নয়।

সার কথা, মানুষ যখন থেকে হাতিয়ার ধরতে শেখে তখন থেকেই তার স্বরযন্ত্রের উন্নতি হতে থাকে। আগে অঙ্গভঙ্গি ও হাতের ইসারাই ছিল তার ভাবপ্রকাশের বাহন। কিন্তু হাত যখন আটকা পড়লো হাতিয়ারে তখন ইসারা সম্ভব হল না—মুখ দিয়ে শব্দ করতে হলো।

গোষ্ঠীবদ্ধ হতে না পারলেও মানুষের মুখে ভাষা আসতে পারতো না। এই নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। পরীক্ষার সিদ্ধান্ত-গুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, অপরের সাহায্যেই মানুষ কথা বলা রপ্ত করে। একটি শিশুকে যদি অরণ্যে প্রতিপালন করা হয় এবং প্রথম থেকে তার সঙ্গে যদি কথা বলা না হয় তাহলে সে বড় হলে কথা আয়ত্ত করতে পারে না। বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে তার দ্বারা বনের মধ্যে মানব শিশুকে প্রতিপালন করিয়েছেন অনেকে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, কথা বলা তো দূরের কথা, শিশু বড় হলে পশুর মত হাঁটতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নেকড়ে মায়ের দ্বারা পালিত মানবশিশুর বহু গল্প আমরা পড়ি। সেই গল্পগুলি নিছক কল্পনা নয়—বেশ কিছু যুক্তি তার মধ্যে আছে।

অতএব হাজার হাজার বছর দলবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলেই এসেছে

ভাষা। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে তারা কতকগুলো অর্থবোধক ও ধ্বনিযুক্ত শব্দ আবিষ্কার করেছিল। সেইসব শব্দকে বংশ পরম্পরায় তারা ব্যবহার করে আসছিল এবং নতুন নতুন শব্দ যোজনাও করেছিল। অপরদিকে দল বা গোষ্ঠীর বাহিরে সেই শব্দগুলি ছিল একেবারে অর্থহীন।

ছবি আঁকা—

মানুষের মুখে ভাষা আসার অনেক আগেই তারা ছবি আঁকতে শিখেছিল। সেদিনের অঙ্কিত ছবির প্রায় সবগুলিই ছিল হয় জন্তু-জানোয়ারদের ছবি নয়ত শিকারের ছবি। যেহেতু শিকারই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তাই পরিবারের বয়স্করা ছবি এঁকে তরুণদের শেখাতো, শিকার কেমন করে করতে হয় এবং কোন্ জন্তু কেমন দেখতে। সে ছবিতে কল্পনার কোন স্থান ছিল না, বাস্তবে যা দেখতো তাকেই রূপ দিত চিত্রে। এই হিসাবে যাঁরা মনে করেন, প্রথমে মানুষ ছবি এঁকেই মনের ভাব প্রকাশ করতো—তাঁরা বড় একটা ভুল বলেন না।

মানুষ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করে তখন তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে গেছে। একটি গুহায় বহুজনে বাস করতো। এমনকি কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করতো সেখানে। অবশ্য আজকের মত সেদিন জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ার কোন উপায় ছিল না। অকালে রোগে, কোন দুর্ঘটনায় ও হিংস্রজন্তুর কবলে অনেককে প্রাণ বলি দিতে হতো। অতএব কয়েক পুরুষ ধরে বেশ কিছু পরিবারের একটিমাত্র গুহার মধ্যে থাকতে কোন অসুবিধা হতো না।

একান্নবর্তী সেইসব পরিবারের অসমর্থ বয়স্করা শিকারে যেতো না। তাদের কাজ ছিল ছবির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা এবং দল পরিচালনা করা। সেদিন বয়স্কদের প্রতি দলের সবার ছিল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বয়স্করাও পালন করে যেতো নিজ দায়িত্ব। তারা আঁকতো ম্যামথ, বাইসন, গণ্ডার, বলগা হরিণ প্রভৃতির ছবি। মুছে ফেলতো না

কোনদিনই। পুরুষানুক্রমে চলতো এইভাবে ছবি আঁকার কাজ। ছোটরা জ্ঞানোম্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত হতো এইসব জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে।

প্রাচীন গুহাগাত্রগুলি জন্তু-জানোয়ারের ছবির এক একটি যেন গ্যালারি। ছবিগুলো বেশ নিখুঁতও। আজকের বড় বড় শিল্পীদেরও বিস্ময় উদ্রেক করে। ওরা ছবিতে রঙও দিতো এবং গুহার গায়ে পাথর কেটেও ছবির রূপ দিতো। সেদিন অন্ধকার গুহায় একজন তরুণ হয়ত জ্বলন্ত একটা কাঠ ধরে থাকতো আর কোন একটি বয়স্ক লোক ছবির পর ছবি এঁকে চলতো। তবে নিছক খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অথবা সৌন্দর্যের তাগিদে যে তারা ছবি আঁকতো, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। তারা ছিল একেবারে বস্তুবাদী। মনের আবেগ কিংবা খেয়ালকে আদৌ প্রশ্রয় দিতোনা।

তাদের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল। আজকের শিল্পীদের মত যা দেখতো তার খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করতো এবং চিত্রে রূপ দিত। অর্থাৎ শিল্পীর চোখ ছিল তাদের। প্রমাণস্বরূপ, আজকের দিনে ম্যামথ পাওয়া যায় না। প্রায় আঠার কিংবা বিশ হাজার বছর আগে তারা যে ম্যামথের ছবি এঁকেছিল আজকে তাদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হতে দেখা গেছে, সেই সব চিত্রের সঙ্গে আছে হুবহু মিল। বলগা হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতির ছবিতেও একেবারে বাস্তবের ছাপ।

শিকারের যে সব ছবি দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই হরিণ শিকারের দৃশ্য। শিকারীরা তীর ধনুক নিয়ে তাড়া করছে হরিণদের, আর হরিণরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। মিশরের প্যাপিরাসে এই ধরণের ছবি বেশী দেখা যায়। তাই অনেকে শিকারের ছবিকে অনেক পরবর্তীকালে স্থান দিতে চান।

অতএব আমরা ধরে নিতে পারি আজকের মত সেদিনের ঠাকুরদা-ঠাকুমারা গুহায় আলো-অন্ধকারের লুকোচুরির মধ্যে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দু একটি অর্থবোধক শব্দ ও চিত্রের মাধ্যমে গল্পে মশগুল হয়ে উঠতো। নাতি-নাতনীরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতো

আর ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করতো। আবার তারা যখন বুড়ো হতো তারাও ছোটদের কাছে নিয়ে বসতো। ব্যক্ত করতো ঠাকুরদা-ঠাকুমার অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে যোগ করতো নিজের অভিজ্ঞতাও।

আদি মানবের ছবি আঁকার ভেতর দিয়ে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফল লাভ হয়েছে। সেই ছবি থেকেই কালক্রমে উৎপন্ন হয়েছিল চিত্রলিপির। অর্থাৎ আদি মানবের আঁকা সেইসব চিত্রের মধ্যেই নিহিত হয়েছিল লিপি—যা সভ্য মানুষের ভাব প্রকাশ এবং আপন অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চার করার একমাত্র মাধ্যম। যদিও উক্ত ঘটনা অনেক পরবর্তীকালের।

তীর ধনুকের ব্যবহার—

ক্রোমাগনন মানুষের পূর্বে কেউ তীর ধনুক আবিষ্কার করতে পারেনি। কারণ, গুহাগাত্রে যে সব তীর ধনুকের ছবি পাওয়া গেছে সেগুলিকে বিশেষজ্ঞরা আজ থেকে আঠার কিংবা বিশ হাজার বছর পূর্বে স্থান দিতে চান না। অধিকাংশ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০ বছরের পরে অঙ্কিত হয়েছিল।

তীর ধনুক ক্রোমাগননদের ছিল উন্নত হাতিয়ার। এবং বন্দুক আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল ব্যাপক। আজও আদিবাসীদের মধ্যে ঐ তীরধনুকেরই ব্যবহার সর্বাধিক। তবে এটি আকস্মিকভাবে অথবা সুদীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। তবে ক্রোমাগননরা ঐ তীর-ধনুক আবিষ্কার করেছিল বলেই অন্যান্য গোষ্ঠীকে হটাতে সক্ষম হয়েছিল।

রান্না করা—

রান্না করা খাদ্যগ্রহণ মধ্য প্রস্তর যুগের একেবারে শেষ ধাপের আবিষ্কার বলে অনেকে মনে করেন। মানুষ তখন পাথর কেটে পাত্র গড়তে পেরেছে এবং উনানও তৈরি করেছে। অপরদিকে পাথর খুঁজতে খুঁজতে খনিজ লবণের স্বাদ গ্রহণ করেছিল অনেক আগে। আপন দেহনিঃসৃত স্বেদও ছিল লোনা। স্বেদমিশ্রিত সিদ্ধ মাংস খেয়ে হয়ত

লাভ করেছিল অমৃতের স্বাদ। তারপর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সীমিত পরিমাণে লবণ যোগ করে সুসিদ্ধ মাংস গ্রহণ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে।

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ

(আনুমানিক ১০000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

খ্রীষ্টজন্মের দশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ রীতিমত সভ্য হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর আবহাওয়াও তখন মনোরম। এসে গেছে আধুনিক জীব ও উদ্ভিদ। পৃথিবী কল্যাণময়ী মূর্তি ধারণ করেছে। জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন।

প্রাকৃতিক পরিবেশও তখন ভারি চমৎকার। গাছে গাছে ফুল ও ফল, নদী ও ঝরণায় সুশীতল জল, নদীর তীরে শ্যামল তৃণক্ষেত্র, মাঠে মাঠে মুক্ত বাতাস, নদীর জলে বিচরণ করছে অসংখ্য মাছ, তৃণক্ষেত্রগুলিতে ধরেছে শীষ, আর তৃণভূমিতে দলে দলে তৃণভোজী প্রাণী। এই অবস্থায় মানুষ আর গুহার ভেতরে বসে থাকতে চাইলো না। দাঁড়ালো মুক্ত আকাশের তলায়। প্রকৃতির সেই মন ভোলানো রূপ দেখে বুঝিবা ততদিনে একটু উদাস উদাস হয়ে উঠলো।

এদিকে পৃথিবীর বুকে দীর্ঘকাল কোন বিপর্যয় না আসায় মানুষের বংশও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। উক্ত কারণে বনে তখন খাদ্যাভাব ঘটেছে। মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে গুহা থেকে বেরিয়ে প্রথমে যাযাবর জীবনযাপন করতে আরম্ভ করেছিল। একদিন বুঝতে পারলো, বন অপেক্ষা হ্রদ কিংবা নদীর তীর অনেক সুখের ও নিরাপদের। মাছ কাঁকড়ার অভাব নেই, ছোট ছোট পশুও পাওয়া যায়, তৃণের ডগায় যে সব শস্য দানা বাঁধে সেগুলি খেতেও মন্দ নয়। অপরদিকে মাছ শিকারে তেমন পরিশ্রমও নেই এবং বিপদও কম।

মানুষ তাই নদী অথবা হ্রদের তীরে ঘর বাঁধতে শুরু করলো। সে ঘরগুলি ছিল তাদের পরিত্যক্ত গুহার অনুরূপ। ডালপালা পুঁতে এবং উপরে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে গম্বুজের মত ঘর বানাতো। বৃষ্টির জলে

কাদামাটি ধুয়ে যাতে না যায় তার জন্য উপরে চাপাতো শুকনো পাতা কিংবা শুকনো তৃণ।

তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল বেশ উন্নত। পাথরের হলেও ভালভাবে ঘষে মেজে মসৃণ করতো। পাথরের ছুরি তৈরি করে হাড়ের বাঁট লাগাতো। গাছের ডালপালা কাটার জন্য পাথরের কাটারি ও করাতের মত অস্ত্র তৈরি করতো। তাছাড়া ছিল পাথরের তৈরি কুঠার, শিং-এর তৈরি বর্শা ও তীর ধনুক। উক্ত যুগটাকে অনেকে তাই মসৃণ পাথরের যুগরূপে চিহ্নিত করে থাকেন।

উক্ত সময়টাতে তারা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিল এবং সভ্যতার বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উদ্ভাবন করেছিল। তাদের মধ্যে নদী পারাপারের জন্য কাঠের ভেলা, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও বস্ত্রবয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তারা বন্যপশুকে পোষ মানিয়েছিল এবং কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে কৃষি কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

এই যুগেও তারা দলবদ্ধভাবে বাস করতো এবং উৎপন্ন ফসল এক জায়গায় থাকতো। তখনও শাসক-শোষক ও ধনী-দরিদ্রের উদ্ভব হয়নি।

নৌকো ও ভেলা নির্মাণ—

মানুষ যখন গুহায় বাস করতো তখন জলকে বড় ভয় করতো। এড়িয়ে চলতো নদী ও হ্রদকে। মনে হয় সেদিন পানীয় জল সংগ্রহ করতো ঝর্ণা থেকে। কিন্তু যখনই তারা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল, তখনই নদীকে অতিক্রম করার প্রয়োজন অনুভব করলো। প্রথমে তারা শুকনো ও হালকা গাছের গুঁড়িকে অবলম্বন করে নদী পারাপার হতো। কিন্তু এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন নিরাপত্তা ছিল না, অপরদিকে তেমনই জিনিসপত্র ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বহন করারও অসুবিধা ছিল। তাই বুদ্ধি খরচ করে অনেকগুলি গুঁড়িকে শক্ত লতায় বেঁধে ভেলার রূপ দান করেছিল।

পরের দিকে অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় বড় বড় কাঠের গুঁড়ির

এক পাশ কেটে ভেতরটা পুড়িয়ে ফেলতো এবং কুরে কুরে ডোঙার রূপ দিত। যেমন আজকের দিনে জেলেরা তালগাছের গুঁড়ি থেকে ডোঙা তৈরি করে। পরের দিকে ডোঙার উন্নত রূপ দিতে গিয়ে তারা তৈরি করেছিল নৌকা। মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তারা নৌশিল্পে এমন উন্নতি লাভ করেছিল যে, নদীতো দূরের কথা দুস্তর মহাসমুদ্রের বুকেও পাড়ি জমাতে পেরেছিল।

মৃৎপাত্র নির্মাণ —

মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষ বড় বড় গোলাকার কিংবা চৌকো পাথরকে কেটে প্রয়োজনের তাগিদে থালা, বাটি কিংবা কুঁজার রূপ দিত। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হলেও সেদিন মানুষ কোন শ্রমে কুণ্ঠা বোধ করতো না। সারাটা দিন আহার অন্বেষণে ব্যয় করতো এবং রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে এক নাগাড়ে পাথর ঘষতো কিংবা কাটতো।

মানুষ পাথুরে জায়গা পরিত্যাগ করে যখন নদী কিংবা হ্রদের তীরে এলো তখন ঐ পাথরের পাত্র দিয়েই কাজ চালাতো। কিন্তু পাথর হলেও সেগুলি ছিল ভঙ্গুর। অনেক দূরের পাহাড় থেকে পাথর বহে এনে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের রূপদান করা ভয়ানক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। হ্রদ কিংবা নদীর কাদামাটিকে কাজে লাগিয়ে মৃৎপাত্র নির্মাণের উদ্যম একরকম তখন থেকেই শুরু হয়।

অথবা আমরা মনে করতে পারি, মৃৎপাত্র প্রথমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই নির্মান করেছিল। চিরকালই তারা অনুকরণ প্রিয়। তার উপর কাদামাটির দিকে আকর্ষণ তাদের বরাবর। বড়দের দেখাদেখি মনের খেয়ালে ঘর বানাতো. পুতুল গড়তো এবং থালা বাটিও তৈরি করতো। পরে রোদে শুকিয়ে নিলে বেশ শক্ত ও মজবুত হতো।

ছেলেদের এই খেলাটি নিশ্চয়ই বড়দের দৃষ্টিকেও একদিন আকর্ষণ করেছিল। ভঙ্গুর যাতে না হয় তার জন্য কেউ হয়ত কোন এক শুভ মুহূর্তে অগ্নিকুণ্ডে প্রদান করে বিস্মিতও হয়েছিল। বস্তুতঃ মৃৎপাত্র পুড়িয়ে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক আত

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে ধরা যেতে পারে। সেদিন তারা বুঝতে পেরে-ছিল কাদামাটিকেও পুড়িয়ে ফেললে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় এবং জল তাকে ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই পরের দিকে তারা মাটির দ্বারা ইট তৈরি করে পুড়িয়েছিল এবং সেই পাকা ইট দিয়ে পাকাবাড়ী বানিয়েছিল। পত্তন করেছিল সুসভ্য নগর সভ্যতার। এ সময় পর্যন্তও তারা কুমোরের চাকের মত চাক আবিষ্কার করেনি। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে একরকম তাম্রযুগেই।

বনের পশুকে পোষ মানালো—

মানুষ যখন অরণ্যে ছিল তখন তৃণভোজীদের হত্যা করতো মাংসের জন্য এবং বাঘ, ভালুক ইত্যাদিকে হত্যা করতো চামড়ার জন্য। তবে হরিণের চামড়াও ব্যবহার করতো তারা। সেদিন ছোট বড় কোন পশুর প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল না।

আমরা মনে করতে পারি, পশুপালনের মূলে আছে ছোটদেরই অবদান। ধরা যেতে পারে একটি ঘটনা। সেদিন শিকারীরা বলগা হরিণ শিকার করতে গিয়ে একটি মা হরিণকে হত্যা করেছিল। তার ছিল দুটি ছোট ছোট শাবক। ওদের হত্যা করার প্রয়োজন অনুভব না করায় জীবন্ত অবস্থায় বাসায় নিয়ে এসেছিল। হয়ত তাদের পুড়িয়ে খাওয়ার ইচ্ছা ছিল।

বাসায় ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। বড়দের শিকার করা পশুদের দেখার জন্য তারা ছুটে এসেছিল এবং দেখতে পেয়েছিল সুন্দর দুটি হরিণ শাবককে। কোলে করার জন্য হয়ত কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছিল তাদের মধ্যে। ওদের আনন্দ দেখে আর হত্যা করেনি বড়রা।

হয়ত সেই শাবকদুটিকে পালন করেছিল ছেলেমেয়েরা। কচি ঘাস ও লতাপাতা এনে খাওয়াতো, কাছে নিয়ে ঘুমাতো, বেড়াতে গেলেও সঙ্গে করতো।

ধীরে ধীরে বড় হলো শাবকদুটি। এখন তারা বড়দেরও ভয় করে না। খাওয়ার সময় সবার কাছে ঘুরঘুর করে নাচে, বনে গেলেও পুনরায় ফিরে

আসে। বড়রাও দেখতো সেই দৃশ্য। অবশেষে তাদেরও মায়া পড়ে যায়। বড় হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করার ইচ্ছা হলো না। একদিন এরাও বাচ্চা দিল এবং দুধও পাওয়া গেল। বড়রা তখন অন্যকথা চিন্তা করলো। ওদের পালন করতে পারলে দুদিকেই লাভ। ঘরে বসে মাংসও পাওয়া যাবে এবং দুধও পাওয়া যাবে।

আরও কেটে গেল কতকাল। ধীরে ধীরে পশুর স্বভাব তারা বুঝতে পারলো। বুঝতে পারলো, পশুরা ভালবাসার বড় কাঙ্গাল। যারা খেতে দেয় তাদের সঙ্গ তারা পরিত্যাগ করে না। জীবনের বিনিময়ে প্রভুর উপকার করে যায়। ওরা বিশ্বাসঘাতক নয়, ভালবাসার মধ্যে একটুও খাদ নেই, দুঃসময়েরও বন্ধু।

পশুর উপরোক্ত গুণগুলো মানুষের চোখে ধরা পড়তে অনেক সময় লেগেছিল। যখনই তারা বুঝতে পারলো তখন থেকেই পোষ মানাতে আরম্ভ করলো পশুকে। তবে প্রথমে মনে হয় ওরা পোষ মানিয়েছিল বলগা হরিণ ও কুকুরকে।

ওরা বলগা হরিণের মাংস ও দুধ খেতো। তাছাড়া গাড়ীও টানতো বলগা হরিণেরা। সে গাড়ীতে কোন চাকা থাকতো না। চার কোণা একটা বাক্সের মত অথবা চৌকো অথবা গোল একটা কাঠের চাকতির সঙ্গে লম্বা লম্বা দড়িতে বেঁধে দিত কয়েকটা হরিণকে। চালক তাড়া করলে হরিণরা টানতে টানতে নিয়ে যেতো।

কুকুর সাধারণত তাদের শিকারে সাহায্য করতো। তবে গাড়ীও টানতো। কুকুরের সাহায্য গ্রহণের পর ওদের শিকার করাটা অনেক-খানি সহজ হয়ে উঠেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

বলগা হরিণ ও কুকুরকে পোষ মানানোর পর তারা পোষ মানিয়ে-ছিল গরু ও মহিষকে। অতঃপর নিরীহ মেষদের। প্রকৃতপক্ষে গবাদি পশুকে পোষ মানিয়েই তারা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। প্রথম প্রথম মানুষ ওদের পালন করতো মাংস ও দুধের জন্য। পরের দিকে নিয়োগ করেছিল লাঙ্গল টানার কাজে।

সেদিন ঘোড়াকে তারা পোষ মানাতে পারেনি। মনে হয় দ্রুতগামী

এই জন্তুটিকে পোষ মানাতে মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করতে হয়েছিল এবং মাত্র দু একটি গোষ্ঠীই পোষ মানাতে পেরেছিল। সেও অনেক পরে অর্থাৎ তাম্রযুগের প্রথম ভাগে।

পশুকে পোষ মানানোর ব্যাপারে মানুষকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল, সব পশু পোষ মানতে চায় না। বিশেষতঃ হিংস্র জন্তুরা কিছুতেই তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু তৃণভোজীরা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বস্ত্রবয়ন—

নব্য প্রস্তর যুগের শেষের দিকে মানুষ বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। ততদিনে ওরা বেশ সভ্য হয়ে উঠেছে। তবু অরণ্য পরিত্যাগ করলেও অরণ্যের মায়া কাটাতে পারেনি. নদী কিংবা হ্রদের তীরে ঘর বাঁধলেও কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, পশু-পালন ও মৎস্য শিকারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলেও শিকার করাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেনি।

পশুপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল প্রধানত ছেলেদের উপর। বড়দের অনেক কাজ ছিল, তাই পশুদের নিয়ে মাঠে যেতে হতো ছেলেদের। তারা সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো, গাছে চড়তো, ছোট ছোট পশুপাখীদের পেছু নিতো, আর সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরে আসতো।

মানুষ অনেকটা যাযাবরও ছিল সেকালে। এক জায়গায় মাঠের ঘাস ফুরিয়ে গেলে, নদীতে পূর্বের মত পর্যাপ্ত মাছ-কাঁকড়া পাওয়া না গেলে আবার নতুনের সন্ধানের বেরিয়ে পড়তো।

সেদিনও গাছে গাছে গুলঞ্চলতা দোল খেতো, এখানে ওখানে জন্মাতো কেয়া ও পাট জাতীয় গাছ। কেয়ার মূলের রোঁয়া, পাটগাছের শুকনো অথবা পচা বাকল ছেলেদের কাছে ছিল বড় প্রিয়। কথায় কথায় ওদের দড়ির প্রয়োজন হতো। তাই দড়ির অভাব মেটাতো এদের দিয়ে।

অরণ্যের প্রান্তে পশুচারণ ভূমিতে ঘোরাফেরার সময় তারা দেখতো, এক জাতীয় ঝোপের মাথা ফল পাকলে সাদা হয়ে যায়। সাদা সাদা রেঁায়া উড়ে বাতাসে, তলাটাও একেবারে সাদা হয়ে যায়। একদিন হয়ত কোন কৌতূহলী রাখাল বালক সাদা রেঁায়াগুলোকে পরীক্ষা করেছিল এবং পাক দিয়ে সুতায় পরিণত করেছিল। তারপর সেই সুন্দর সাদা ও টেকসই সূতোকে নিয়ে নানা কাজে ব্যবহার করেছিল। তার দেখাদেখি অন্যরাও তৈরি করেছিল সূতো।

ক্রমে বড়রাও উপলব্ধি করেছিল এর উপযোগিতা। লতার চেয়ে তূলোর দড়িতে গিঁট দেওয়া বেশ সুবিধা। নষ্ট হয় না তাড়াতাড়ি, দীর্ঘকাল ওর চমৎকার রঙটাও বজায় থাকে। প্রথম প্রথম তাই সূতো দিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরি করতো, পরিধেয় চামড়াকে সেলাই করতো, ইত্যাদি।

এদিকে মানুষ কিছুটা শৌখিন হয়ে পড়ায় কোমরে পরিধেয় হিসাবে চামড়াকে জড়াতে একটু ঘৃণাবোধ করতে আরম্ভ করেছিল। আবার গরমের দিনে পশুচর্ম গায়ে জড়িয়ে ঘোরাফেরা করতেও বেশ অস্বস্তি বোধ করতো। তাই অনেকে গাছের বাকল পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিনে তূলোকে পেয়ে ওরই সাহায্যে পরিধেয় বানাতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। তবে কার মাথায় যে এই পরিকল্পনা এসেছিল তা অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, বস্ত্র বয়ন যার মাথায় এসেছিল সে একজন সেরা বিজ্ঞানী ও কারিকর। বস্তুতঃ সে মানুষকে যা দিয়ে গেছে তার কোন তুলনাই হয় না।

প্রথম প্রথম কম্বলের মত মোটা মোটা সূতোকে বিনুনি দিয়ে কাপড় বানাতো, পরে কাঠের চৌকো ফ্রেম বেঁধে তাতে সূতোর টানা দিত এবং হাত দিয়ে পোড়েন বুনতো। এইভাবে প্রস্তুত কাপড় ভয়ানক মোটা হতো এবং লম্বা চওড়ায়ও বেশী হতো না। কেবল কটি দেশেই ভাল-ভাবে জড়ানো যেতো। ছোট মাপের অত্যন্ত মোটা একখানা কাপড়ের জন্য খুব কম পরিশ্রম করতে হতো না।

এই জাতীয় কাপড় মানুষ দীর্ঘকাল ব্যবহার করেছিল। মিশরের

ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে কিংবা পেপিরাসের উপর যে সব ছবি পাওয়া গেছে, তাতে রাজা ও রানীদের পরিধেয় দেখলেও আমাদের হাসির উদ্রেক করে। একমাত্র কটি দেশ ছাড়া অন্যত্র কোন আবরণ নেই। অথচ গায়ে কত রকমের অলঙ্কার!

বস্ত্র সে সময় দুর্মূল্য ছিল বলে মনে হয়। সেই কারণে রাজারাও বস্ত্রের বাহুল্য বর্জন করতেন। কোন কাপড়ই তখন পাতলা ছিল না। উন্নত বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে এবং মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষই উদ্ভাবন করেছিল।

কৃষিকাজ ও গৃহনির্মাণ—

নব্য প্রস্তর যুগের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ঘরবাড়ী বলতে কিছুই ছিল না বলা চলে। যাযাবর জীবনযাপনের সময় গুহার অনুকরণে গম্বুজের মত ঘর বানাতো। পশুপালন ও শিকার ছিল একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু যখন তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটলো তখন অরণ্য এবং পশু তাদের খাদ্যের চাহিদাকে আর ভালভাবে পূরণ করতে পারলো না। এই অবস্থায় নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করলো তারা।

একদিন তাদের অবশ্যই চোখে পড়েছিল, নদীতীরে গাছ-গাছড়া বেশ ভাল জন্মায়। এখানকার মাটি পাথুরে মাটির মত এত শক্ত ও রুক্ষ নয়। অল্পায়াসে একখানা ডালপালা দিয়েও মাটিকে আলগা করা যায়। অপরদিকে নদীতীরে যে সব তৃণ জন্মাতো তাদের অধিকাংশের ডগায় এক সময় দানা বাঁধতে শুরু করে। সেগুলো কাঁচায় অথবা সেদ্ধ করে খেলে পেটও ভরে, ভালও লাগে।

বছরের পর বছর তারা লক্ষ্য করতো এক বিশেষ ঋতুতে ঐ তৃণ-গুলি জন্মায় এবং কিছুকাল পরে তাতে শস্য দানা বাঁধে (বিগত তুষার যুগের শেষে পৃথিবীতে আপনিই শস্যের আবির্ভাব হয়েছিল)। শস্য পাকার পর গাছগুলি মরেও যায়। হয়ত সেদিন কোন বয়স্ক ব্যক্তি কয়েক মুঠি শস্যদানা সংগ্রহ করেছিল এবং পরের বছর যথাসময়ে নদী-গর্ভের রসাল পলিমাটিকে আঁচড়ে চাষ করেছিল। আশাতিরিক্ত ফল

লাভ করে এবং সেই থেকে চাষের প্রচলন হয়।

ফসল হাতে পেয়েই তারা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। আগে শীতকালে নদীগর্ভে জল থাকতো না বলে কেবল নদীগর্ভেই চাষ করতো। পরের দিকে অধিক ফসলের আশায় নদীতীরের বিস্তীর্ণ এলাকাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলো। অথচ ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গল ছিল না, ছিল না জলসেচের জন্য কোন উপাদান। বুদ্ধি খরচ করে তারা গাছের ডালের সঙ্গে পাথরের ফলক বেঁধে কোদাল ও লাঙ্গল বানিয়েছিল। প্রথমে সে লাঙ্গল মানুষেই টানতো। সে সময় চাষ করাটাও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তারা কাজের মানুষ ছিল বলেই চাষবাসকে আয়ত্ত করেছিল।

উপরোক্ত উপায়ে খুব বেশী জমি চাষ হতো না। জমির মালিকানাও ছিল না। একটা দলের সবাই মিলে যতটুকু পারতো চাষ করতো, একান্নবর্তী পরিবারের মত সবাই একসঙ্গে খেতো। ফসল শেষ হ'য়ে গেলে বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করতো।

একথাও সত্য যে, সব দল যে একই সঙ্গে অরণ্য পরিত্যাগ করে নদীর তীরে চাষবাস আরম্ভ করেছিল এমন নয়। একটি দল হয়ত প্রথমে কৃষিকাজের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। পরে তাদের দেখাদেখি অন্যান্য দলরাও এগিয়ে আসে। অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু এই দলের মানুষরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নদীর কূলে বসতি স্থাপন করেছিল। অনেক পরে তারা লাঙ্গলের উন্নত রূপ দিয়েছিল এবং লাঙ্গল টানার কাজে পশুকে নিয়োগ করেছিল।

চাষের কাজে মন দেওয়ার পর তাদের অবস্থা হয় ঋষির সেই কৌপিনের মত। কৌপিনকে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করতে বেড়াল পুষতে হলো, বেড়ালের জন্য গরু, গরুর জন্য রাখাল, তারপর ঘরদোর, স্ত্রী-পুত্র, অবশেষে তপোবনে সংসার পেতে বসলেন ঋষি। তেমনই মানুষ যখন চাষবাসে মন দিল তখন যাযাবর জীবনকে পরিত্যাগ করতে হলো, পশুপালন করতে হলো, চাষের সরঞ্জাম ও ফসলকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলো, হরেক রকমের ফ্যাসাদ! তাই পূর্বের সেই

গম্বুজাকৃতি অপরিসর ঘর অথবা নদী ও হ্রদের উপর কাঠের ঘর আর চললো না। প্রয়োজন হয়ে পড়লো গৃহপালিত পশুদের জন্য ঘর, শস্য রাখার জন্য ঘর, আসবাবপত্র রাখার জন্য ঘর, ওঠাবসা ও রাত্রিযাপনের জন্য ঘর, রান্না খাওয়ার জন্য ঘর, অনেক কিছু। তাই এবার ঘরেরও সংস্কার করতে হলো।

আগে মানুষের গুহাই ছিল ঘর। গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর গুহার আকারের গম্বুজাকৃতি ঘর বানিয়েছিল। পরে হিংস্র জন্তুদের ভয়ে নদীর অথবা হ্রদের বুকে কাঠ পুঁতে এবং কাঠের বেড়া দিয়ে কাঠেরই ঘর বানিয়েছিল। সে ঘর দোতলাও করতো এবং উপরে ছাউনি দিতো। ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভেলা বা ডোঙা। হিংস্র জন্তুর ভয় কমতে তারা নদীর বুক থেকে ডাঙায় এলো। নদীতে বন্যা আসে বলে উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে এবং বন থেকে কাঠ বহে এনে ঘর তৈরি করলো। এত দিনে মানুষের জীবনেও এসেছিল কিছুটা নিরাপত্তা। মনের মত ফসল লাভ করায় জীবনে এলো সুখ ও স্বস্তি। এক নতুন সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটন হলো। সেই সভ্যতাকে আমরা কৃষি-সভ্যতা বলতে পারি। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সেটি যেন এক বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল।

পৃথিবীর বহু নদীর তীরেই সেদিন গড়ে উঠেছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। কালক্রমে অধিকাংশ সভ্যতাই লুপ্ত হয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেছে বৈদেশিক আক্রমণে ও ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে। আজ ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেদিনের নব্য প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও জিনিসপত্র। বহু নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মধ্য প্রস্তর যুগেও কিছু কিছু মানুষ ভিড় করেছিল নদীর তীরে। পরে সেখানে হানা দেয় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ। উন্নত হাতিয়ারের সাহায্যে হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই বসতি শুরু করেছিল। অথবা মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষ পরাজিত হয়ে ওদের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে মানুষের জন্মলগ্ন থেকে একরকম আজও পর্যন্ত।

মানুষ সেদিন যে শস্যগুলি চাষ করতো তাদের মধ্যে প্রধান ছিল

গম ও যব। ধান চাষ করতো না বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে যে সব জায়গায় উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেখানকার ধ্বংসাবশেষ থেকে ধান কিংবা চালের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে একমাত্র চীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সুমের-মিশর-সিন্ধু প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অনেক পরবর্তী চীনসভ্যতা।

নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগ পর্যন্ত সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। শত শত মানুষ এক জায়গায় বাস করতো, নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরাই উৎপাদন করতো। খাদ্য ও পরিধেয় ছাড়া অপর কোন চাহিদা ছিল না, ছিল না বিলাসী ও কর্ম বিমুখ।

ওরা কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না। ওদের মনে তখনও পর্যন্ত সঞ্চয়ের মনোভাব আসেনি। সঞ্চয়ের মনোভাব না থাকায় সর্বপ্রকার নীচতা, শঠতা ও কপটতা থেকে মুক্ত ছিল তারা। তাই আজকের দিনে বহু চিন্তাবিদ সেদিনের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগে মানব সভ্যতার আদিরূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জীবনে নিরাপত্তা আসায় এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম লাঘব হওয়ায় মানুষ বিলাষী ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। অলস মস্তিষ্কে আসে স্বার্থচিন্তা অপরদিকে নদীর কলতান, পাখীর কাকলি, বাতাসের মর্মরধ্বনি তাদের কানের কাছে মধুবর্ষণ করতে থাকে। পাখীর ওড়ার ছন্দ, পলায়মান মৃগের গতির ছন্দ, ময়ুর-ময়ূরীর নৃত্যের ছন্দ মনকে উতলা করে তোলে। পুষ্পের মাধুরী, অরণ্যের শ্যামলিমা, শস্যের সুষমা দেখে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিস্মিত হয় আকাশের নীলিমা, সূর্যের রশ্মিজাল, রাত্রির আকাশের চন্দ্র ও তারামণ্ডলীকে দেখে। তাই উক্ত সময় থেকে তারা চিন্তাশীলও হয়ে ওঠে। কিন্তু লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তারা মনের ভাবকে রূপ দিয়েছিল চিত্রে। সেসব চিত্র এমন জীবন্ত যে, আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

* সেকালের মানুষের আচার-অনুষ্ঠান *

সেদিন মানুষের মনে ঈশ্বর-চিন্তা ঠাঁই পায়নি। সে সুযোগও ছিল না। মানুষ প্রথম যেদিন চোখ মেলে তার আশেপাশে তাকিয়েছিল,

সেদিন সে দেখেছিল এক রুক্ষ ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীকে। চারদিকে ওৎ পেতে থাকতো সাক্ষাৎ মৃত্যুর অনুচররা। গাছের ডালে বিষধর সর্প, ভূমিতে সন্তর্পণে বিচরণরত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু, নদীতে নদীতে কুমীর, এখানে ওখানে পৃথিবীবক্ষ বিদীর্ণ করে তীব্রভাবে বেরিয়ে আসছে আগুনের হলকা। গাছে উঠতে গিয়ে সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, তলায় যুদ্ধ করতে হয়েছে বাঘ-সিংহের সঙ্গে, নদীতে জল খেতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে কুমীরের সঙ্গে।

অতএব একটি মুহূর্তও অন্যমনস্ক হয়ে থাকার উপায় ছিল না আর ছিল না কোন নিরাপদ আশ্রয়। পেটের অগ্নিজ্বালাকে নিবারণ করতে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে সারা দিনটা তাদের হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো। তাই দুদণ্ড বসে ঈশ্বর-চিন্তা করার কোন সময় ছিল না তাদের।

মধ্য প্রস্তর যুগে গুহাবাসী মানব কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করায় তাদের চিন্তা আহার অন্বেষণ ছাড়া কিছুটা অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। তবে সে চিন্তা কোন ধর্মমূলক চিন্তাভাবনা ছিল না। প্রকৃতিকে শান্ত করা, ভালভাবে খাদ্য লাভ করা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু কতকগুলি অন্ধ সংস্কারের বশীভূত হয়েছিল মাত্র। অবশ্য সব সংস্কারের মূলে ছিল অতিরিক্ত খাদ্যলাভ।

সংস্কার বলতে আজকের দিনে আমরা যাকে তুকতাক বলি অনেকটা তেমনই। যেমন দলের দলপতি শিকারে যাওয়ার আগে শিকারের মহড়া দিতো। যেমন কয়েকজন হরিণ সাজতো আর দলপতিসহ অপরাপররা তাদের তাড়া করতো। শিকারে যখন বহির্গত হতো তখনও কিছুটা তুকতাকের আশ্রয় গ্রহণ করতো। নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতো, হাতে মুখে রঙ বেরঙের প্রলেপ দিতো, কোন কোন গাছের পাতা বা বাকলকে সঙ্গে করতো ইত্যাদি। এসবের মূলে ছিল অরণ্যের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া। যেন কিছুটা যাদুবিদ্যার বশবর্তী হয়েছিল তারা।

নৈসর্গিক কতকগুলি ঘটনাকে তারা বড্ড ভয় করতো। যেমন ঝড়, বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এইগুলি যাতে না হয় এবং যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত না হয় তার জন্য পালন

করতো কতকগুলি অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠান ছিল নাচ ও গানের। তাদের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, এই ধরণের অনুষ্ঠান পালন করলে প্রকৃতি শান্ত থাকে।

মানুষের তখন অভাব ছিল অনেক। তবে কোন অভাবকে তারা অভাব মনে করতো না। শুধু খাদ্যাভাবটাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতো। প্রকৃতিকে জয় করে সেই খাদ্যাভাব পূরণই ছিল তাদের একমাত্র মানসিকতা। নাচ-গানের আসর বসাতো, ছবি আঁকতো, ডালপালা নিয়ে লাফালাফি করতো ইত্যাদি। এদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না, ছিল না সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা।

মুহূর্তমাত্র সময় তারা নষ্ট করতো না। দৈবে আস্থা না রেখে আস্থা রাখতো নিজের শক্ত সমর্থ হাত দুটির উপর। প্রকৃতির বুক থেকে জোর করে খাদ্য আদায় করারই প্রয়াস ছিল। প্রকৃতির যে সব শক্তির কাছে তাদের করণীয় কিছু ছিল না সে সব শক্তিকেও জয় করতে চেষ্টা করতো। তবে সে চেষ্টা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকে ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে নয়, কিংবা কোন কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারাও নয়। তারা সেইসব শক্তি তথা ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদির ছবি আঁকতো এবং সময় সময় সেই ছবিগুলিকে ঘিরে স্ত্রী-পুরুষে মিলে নৃত্য করতো। একেবারে নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগ পর্যন্ত চলে আসছিল তাদের এই জাতীয় অনুষ্ঠান।

গুহাগাত্রে অঙ্কিত নানা ধরণের ছবি পাওয়া গেছে। কোন দেবমূর্তি পাওয়া যায়নি। ছবিগুলিতে বিশ্লেষণ করেও কোন দেব-দেবীর পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রায় সবই শিকারী, বাইসন-গণ্ডার-ম্যামথ-হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু এবং ডালপালা, তীর-ধনুক, বল্লম, বর্শা ইত্যাদি। উপরোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে মনে করা হয়, আদি মানব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতো না, কোন শক্তির সাধনা করতো না, এমনকি কারও দয়ার উপরও নির্ভর করতো না। বহু পরে যখন মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা জটিলাকার ধারণ করে, মানুষ স্বার্থান্ধ ও ঈর্ষান্ধ হয়ে পড়ে, লোভ-শঠতা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সমাজকে কলুষিত করতে থাকে তখনই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নানা দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন করেন।

* আদি মানবের সমাজ-ব্যবস্থা *

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেকালে মানুষ ছিল এক একটি বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এক একটি পরিবারের জনসংখ্যা ছিল একশ বা আরও বেশী। যখন পরিবারের লোকসংখ্যা আরও বেড়ে উঠতো তখন ঐ দল থেকে কিছু সংখ্যক অন্যত্র গমন করতো এবং সেখানেও দলবদ্ধভাবে বাস করতো।

দলের একজন পরিচালক থাকতো। ঐ পরিচালকের উপরেই ন্যস্ত থাকতো দলের শুভাশুভের ভার। সাধারণত একজন বয়স্ক ব্যক্তিই পরিচালক নিযুক্ত হতো এবং সমূহ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতো। কোন পরিচালক যদি কোন কারণে পঙ্গু হয়ে পড়তো তবুও তার পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। অপরদিকে পরিচালক দলাকে ভালভাবে পরিচালনা করতে না পারলে সে স্বেচ্ছায় অপরের উপর পরিচালনার ভার অর্পণ করতো।

দলপতির দায়িত্ব যে দলের একজন বুদ্ধিমান ও বলশালীর উপর ন্যস্ত হতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সর্বকাজে ঐ দলপতিই ছিল অগ্রণী। কোন দল কিংবা উপদলের সঙ্গে লড়াই বাধলে অথবা শিকারে গেলে ঐ দলপতিই কৌশল বলে দিত এবং সেইই থাকতো সবার আগে।

আদিম মানবগোষ্ঠীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নারী, পরিচালক সবাইকে কাজ করতে হতো। পরিচালক দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলে সে বসে বসে খেতো না ও আদেশ জারি করতো না, কিংবা খাদ্যের বড় অংশ তার ভাগে পড়তো না। খাদ্যে ছিল সবার সমান অধিকার। কাজটা আবার দলপতিকে বেশীই করতে হতো লড়াইর সময় সেইই প্রাণপণে লড়াই করতো এবং নিজের প্রাণের বিনিময়েও দলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। অসুখ বিসুখ হলে অথবা কেউ কোথাও বিপদে পড়লে দলপতি আগে এগিয়ে যেতো। এক কথায় দলপতি সবার বিপদকে নিজের বিপদ বলে গণ্য করতো। কিন্তু এমন একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছিল যে, তার জন্য দলপতি একটু বেশী কিছু

দাবি করতো না। দলের শিক্ষার ও শাসনের ভারও ছিল তারই উপর।

আদিম মানবগোষ্ঠী ছিল শিশুর মত সরল। বয়স্কদের উপদেশ তারা সব সময় মেনে চলতো এবং দলের প্রতি আনুগত্য ছিল সবারই। একজন বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করতে দল ছুটে যেতো। অপর কোন কোন দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ করতো বটে কিন্তু অযথা হানাহানি ও রক্তারক্তি পছন্দ করতো না।

মনে ওদের হিংসাও ছিল না। আর ছিল না লোভ কিংবা শক্তির দম্ভ। ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত খাদ্যকেও নিজের মনে করতো না। যে যেখানে যা উপার্জন করতো সবই দলের সম্পদ বলে মনে করতো। নিজের সুবিধার জন্য দলের বিপদ ডেকে আনতো না। বরং দলকে বাঁচাতে নিজে জীবন বিসর্জনও দিতো।

অপরদিকে একমাত্র অস্ত্র ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কারও কিছু ছিল না। কারণ, অস্ত্রটা নিজের উপযোগী করে নিজেকেই তৈরী করে নিতে হতো। পাথরও বহে আনতে হতো নিজেকে। একমাত্র অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সঞ্চয়ও তারা করতো না। এমনকি আজকের খাদ্য কালকের জন্যও নয়। তাছাড়া সবাই ভাবতো দলের সবার জন্য। কেবল নিজেরই স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবতো না, বা সুখাদ্যটা নিজের ছেলের হাতে তুলে দিতো না। যেদিন কম খাদ্য রোজগার হতো সেদিন যারা পরিশ্রম করেছে তারা সিংহভাগ দাবি করতো না। শিশু-বৃদ্ধ-নারী সবাই সমান ভাগ পেতো।

একেবারে সুখী ও আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা যাকে বলে। এই সমাজ-ব্যবস্থা কিন্তু কৃষি-সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় তলিয়ে গেছে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই তার মূল কারণ। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার কাঠামোটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে রাজা-প্রজা, শাসক-শোষক। সে আর এক ইতিহাস। মানুষ ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে ঠিকই কিন্তু সেকালের মত সমাজ-ব্যবস্থা বোধহয় আর ফিরে আসবে না।

—: :—